আযাদী আন্দোলন

মাওলানা ফয্‌লে হক খায়রাবাদী

মুহিউদ্দীন খান

মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী

আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

অনূদিত

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

শাখা ঃ ৫৫বি পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী
আযাদী আন্দোলন-১৮৫৭
অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা মুঈনুদ্দীন খান
মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫/৭১১৯২৩৫

৩য় সংস্করণ ঃ
ফাল্গুন ঃ ১৩৮৯

৭ম সংস্করণ ঃ
জুলাই -২০০৬ ইংরেজী
আষাঢ়- ১৪১৩ বাংলা
জমাদিউস্‌সানী-১৪২৭ হিজরী

প্রচ্ছদ ঃ
কুতুবুজ্জামান খান

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
এস.টি. কম্পিউটার
৩৪, নর্থব্রুক হল রোডা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-863-40-7

AZADI ANDOLAN – 1857: Bengali translation of Moulana Fazle Huq khayrabadi's. Assawratul Hindia, Translated by Mohiuddin khan. Published by Madina Publication, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Tk. 30·00 U.S. Dollar : 2

ভূমিকা

মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী রচিত 'আস্‌সাওরাতুল-হিন্দিয়া' সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কিত একটা অতি মূল্যবান দলীল। 'আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭' সেই অমূল্য বই-এর বাংলা অনুবাদ।

মাওলানা খায়রাবাদী এদেশে ক্রমবর্ধমান ইংরেজ আধিপত্য প্রতিরোধ করার লক্ষ্য সামনে নিয়ে সর্বস্তরের জনগণকে এ মহাবিপ্লবে শরীক হওয়ার আহ্বান-সম্বলিত ফতওয়া প্রচার করেছিলেন। তিনি নিজেও বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

বিপ্লবের পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিচার-প্রহসনে হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের সঙ্গে মাওলানা খায়রাবাদীকেও আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। আন্দামানের সেই কঠিন বন্দীজীবনে মাওলানা সাহেব কাফনের কাপড়ের মধ্যে কয়লার সাহায্যে এ মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব ছাড়াও বইটি আরবী ভাষার এক অনুপম সম্পদরূপে পরিচিত। অতীতের বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়ে আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে স্বাধীনতা রক্ষা করা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ দায়িত্ববোধ জাগ্রতকরণের জন্য দেশের জনগণের অতীত ইতিহাসের মোড় ফিরানো প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বলা বাহুল্য, এ প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বইটির বাংলা তরজমা প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রয়াস বলে মনে করি।

আ,জ,ম, শামসুল আলম

অনুবাদকের কথা

শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যাফরের রেংগুন নির্বাসনের সংগে সংগে পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে সাত শতাধিক বৎসরের মুসলিম শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়। অনুরূপ এই উপমহাদেশের মাটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুসলিম জ্ঞানসাধনার যে ঐতিহ্যটি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সিপাহী বিপ্লবোত্তর সীমাহীন নির্যাতন ও বিশিষ্ট জ্ঞানসাধকগণকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো অথবা আন্দামানে নির্বাসিত করার মাধ্যমে জ্ঞান-সাধনার সেই ধারাটিকেও এক প্রকার নির্মূল করিয়া দেওয়া হয়।

দায়িত্ব সচেতন আলেম সমাজ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই দেশের মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের মুনাফেকীতে যখন মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন তাঁহাদের উপর সর্বপ্রথম বৃটিশ নির্যাতনের খড়গ নামিয়া আসিয়াছিল। বিশিষ্ট আলেমগণকে ধরিয়া নির্বিচারে হত্যা অথবা আন্দামানে নির্বাসিত করিয়াই সাম্রাজ্যলোলুপ বৃটিশ শক্তি শান্ত হইতে পারে নাই; বেনিয়া বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহারা এই দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক গ্রন্থাগারও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে চালান দেয়। 'ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী'র গোড়ার কথা যাহারা অবগত আছেন, তাহারা এই সত্য উপলব্ধি করিবেন। তাহা ছাড়া ব্যাপক লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগের সময় যে কত মূল্যবান লাইব্রেরী ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহারও ইয়ত্তা নাই। বলা বাহুল্য যে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সংগ্রহ, ধ্বংসযজ্ঞের হাত হইতে যাহাকিছু রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। একই কারণে এই দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের দ্বারা লিখিত বহু পুস্তকের উল্লেখ এখন মাত্র গ্রন্থতালিকা সংক্রান্ত পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও সেইগুলির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার এই দেশের বহু গ্রন্থের নাম পর্যন্ত দেশের আলেম সমাজ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্যের কোন একাডেমী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ তাহা প্রকাশ করিয়া জগতকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে।

মোগল শাসনের শেষ প্রতীক যেমন ছিলেন বাহাদুর শাহ্ যাফর, তেমনি এই উপ-মহাদেশে প্রাচীন আলেম সমাজের অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান সাধনার প্রতীক ছিলেন মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী। শেষ মোগল সম্রাট শুধুমাত্র কিল্লা ও শহরের চারি দেওয়ালের মালিক মুখতার ছিলেন। তাঁহার দরবারের আমীর-উমরাহ এবং তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বিদ্রূপ করা চলে, কিন্তু সেই শেষ যমানার দিল্লীর বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যেও এমন কতিপয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাদের নাম কোন কালেই ম্লান হওয়ার মত নয়। অমর কাব্য প্রতিভা আসাদুল্লাহ খান গালিব, জহীর দেহলবী, মাওলানা শাহ আবদুল কাদের, মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীন, মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী প্রমুখ ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদীকে প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত খায়রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা ফযলে ইমাম ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধকগণের একজন। তিনি ছিলেন দিল্লীর 'সদরুস-সুদূর' বা সরকারের প্রধান আইন ব্যাখ্যাতা। পিতার যত্নে অতি অল্পবয়সেই আল্লামা ফযলে হক কোরআনের হাফেয ও এলমে মা'কুলাতে (ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাচীন পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি) একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি হাদীস ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করেন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেস মাওলানা শাহ আবদুল আযীযের নিকট। এই সময়ের একটি ঘটনায় আল্লামার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিয়া সম্প্রদায়ের কয়েকটি মতবাদ খণ্ডন করিয়া হযরত শায়খ আবদুল আযীয যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তোহফায়ে এসনা আশারিয়া' রচনা করেন, তখন মুসলিম জাহানের সর্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়। ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাঁহার সমকালীন বিখ্যাত আলেম মীর বাকেরকে একদল আলেমসহ দিল্লীতে হযরত শাহ সাহেবের সঙ্গে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) করার জন্য প্রেরণ করেন। মীর সাহেব উটের পিঠে কিতাব বোঝাই করিয়া দিল্লীতে শাহ সাহেবের আস্তানায় উপস্থিত হন। শাহ সাহেব তাঁহার সম্মানিত মেহমানদের খেদমতের জন্য কয়েকজন ছাত্র নিয়োগ করেন। তন্মধ্যে অল্পবয়স্ক ফযলে হক খায়রাবাদীও ছিলেন। সন্ধ্যার পর খায়রাবাদী মেহমানদের খেদমতে হাজির ছিলেন। মীর বাকের নানা কথায় খায়রাবাদীর পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কথায়

কথায় 'উফুকুল-মুবীন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের দুই একটি জটিল বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা হইল। খায়রাবাদী শুধু যে এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন তাহাই নহে, নতুন কয়েকটি প্রশ্নেরও অবতারণা করিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এই কথাও প্রমাণ করিয়া ছাড়িলেন যে, মূল গ্রন্থকার ঐ সমস্ত বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খায়রাবাদীর এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মীর বাকের স্তম্ভিত হন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, শাহ সাহেবের একটি বালক শাগরিদের জ্ঞান-গরিমার এই পরিচয় পাওয়ার পর খোদ শাহ সাহেবের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার দুঃসাহস করা বৃথা। সুতরাং পলায়ন করিয়া মুখরক্ষা করাই তাঁহারা উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সকাল বেলায় শাহ সাহেব যখন মেহমানদের খোঁজ-খবর লইতে আসিলেন, তখন দেখিলেন, মেহমানখানা শূন্য। অনুসন্ধানের পর যখন জানিতে পারিলেন যে, সন্ধ্যার দিকে খায়রাবাদীর সহিত মীর সাহেবের একদফা আলোচনা হইয়াছিল, তখন তিনি প্রিয় শাগরেদকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং সম্মানিত মেহমানদিগকে এইভাবে ভয় দেখাইয়া দেওয়ার জন্য শাসাইলেন।[১]

খায়রাবাদীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল দিল্লীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও আলেমগণের সংসর্গে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি খায়রাবাদে পিতার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই উপমহাদেশের আলেম সমাজের শীর্ষস্থানে স্বীয় আসন রচনা করিয়া লন।

পিতার ইন্তেকালের পর খায়রাবাদী দিল্লীর শেরেস্তাদারের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। দিল্লীর পরিবেশ ছিল তখন কাব্য ও সাহিত্য আলোচনায় মুখর। গালিব, হাকীম মুমেন খান, মুফতী সদরুদ্দীন খান আযুরদাহ, ইবরাহীম যওক প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকের সঙ্গে খায়রাবাদীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। অমর কাব্যগ্রন্থ 'দীওয়ানে-গালিব'-এর খসড়া পরিমার্জিত করিয়া একটি সর্বাঙ্গসুন্দর দীওয়ানে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়ার জন্য কবি গালিব সেইটি মাওলানা খায়রাবাদীর হাতে সমর্পণ করেন। গালিবের এই অমর দীওয়ানের পাতায় পাতায় মাওলানার সমঝদার হস্তের স্পর্শ বিদ্যমান। গালিব মাওলানার এই শ্রম উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন।[২] গালিবের পত্রাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্র মাওলানা খায়রাবাদীকে লিখিত হইয়াছিল।

১। তাযকেরায়ে-উলামায়ে-হিন্দ

২। গুলেরা'না-পৃঃ ৩১২

মাওলানা ফযলে হক চাকরি জীবনে শেষ পর্যন্ত সদরুস্-সুদূর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-চর্চা ও জ্ঞানীগুণীর সাহচর্যই ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। চাকরি জীবনেও তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী চাকরির দায়িত্ব ও ব্যস্ততা তাঁহাকে জ্ঞানচর্চার মহান ব্রত হইতে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই। বারোটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তাঁহার গভীর প্রজ্ঞার সাক্ষী হইয়া এখন পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি পুস্তক দেশ-বিদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর স্তরে পাঠ্যতালিকাভুক্ত।

মাওলানার প্রত্যেকটি রচনাই ভাষার চমৎকারিত্বে ও বিষয়বস্তুর আলোচনায় একক স্থানের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ মান্তেক ও হেকমত বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থগুলি এমন গভীর তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যে, তাহার প্রতিটি ছত্র পাঠককে এক নতুন বিস্ময়ের জগতে লইয়া যায়।

'আস্সাওরাতুল-হিন্দিয়া' ও 'কাসিদায়ে-ফেতনাতুল-হিন্দ' মওলানার নির্বাসিত জীবনের দুইটি বিলাপ-লিপি। আরবী ভাষার কয়েকটি ক্লাসিক ব্যতীত এই ধরনের গদ্য ও পদ্যের নমুনা বড় একটা দেখা যায় না। আন্দামানের কঠোর বন্দী জীবনে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কাব্যে ও গানে প্রকাশিত হইত। কখনও কখনও সেইগুলি অন্যেরা লিখিয়া রাখিতেন। লেখার মত কোন সরঞ্জামও পাওয়া যাইত না। কাপড়ে, টুকরা কাগজে, কয়লা বা সামান্য পেন্সিল দ্বারা লিখিয়া রাখা হইত।

'আস্সাওরাতুল-হিন্দিয়া' সম্পর্কে 'সিয়ারুল-উলামা' গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে আযাদী সংগ্রামে মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ওয়াজিব বলিয়া ফতওয়াও প্রচার করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা হয় এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নির্বাসন জীবন-যাপন করিবার নিমিত্ত ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তিনি এই অভিশপ্ত দ্বীপেই ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা খায়রাবাদীর বহু পূর্বেই মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরী আন্দামানে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। নির্বাসিত জীবনে তিনি 'তাকবীমুল বুলদান' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া জনৈক ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আন্দামান হইতে

বিদায়ের সময় মাওলানা খায়রাবাদী কাফনের কাপড় বলিয়া কথিত এক টুকরা বস্ত্র ও কতিপয় বিচ্ছিন্ন টুকরা কাগজে কয়লা দ্বারা লিখিত একটা পত্র দিয়াছিলেন এবং বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন এইগুলি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এই কাফনের কাপড় ও টুকরা কাগজের সমষ্টিই 'আস্‌সাওরাতুল-হিন্দিয়া' ও 'কাসিদাতু ফিতনাতিল-হিন্দ' নামক দুইটি পুস্তিকা।

বৃদ্ধ মাওলানাকে আন্দামানের কঠোর বন্দী জীবনে যে নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল,'আস্‌সাওরাতুল-হিন্দিয়া' পুস্তকের ছত্রে ছত্রে তাহার বেদনা অনুরণিত হইয়াছে।

প্রথম বৎসর মাওলানাকে সাধারণ কয়েদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হয়। আন্দামানের তদানীন্তন ডেপুটি জেলার প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিশেষতঃ উপ-মহাদেশের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জেলার সাহেবের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত একটা পুরাতন ফারসী পাণ্ডুলিপি ছিল। এই পুস্তকটির পাঠোদ্ধারের জন্য তিনি উহা জনৈক শিক্ষিত কয়েদীর হাতে সমর্পণ করেন। উক্ত কয়েদী মাওলানা খায়রাবাদীর জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তিনি পুস্তকটি মাওলানাকে দেন। নিঃসঙ্গ কারাজীবনে জ্ঞান-চর্চার একটু সুযোগও ছিল তাঁহার জন্য সান্ত্বনার উৎস। তিনি অতি যত্নের সঙ্গে পুস্তকটি নকল করিলেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় টীকা ব্যাখ্যা লিখিয়া নিলেন। জেলার সাহেব নোট ও ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ মাওলানার দর্শন লাভের জন্য ব্যারাকে ছুটিয়া আসিলেন। মাওলানা তখন ব্যারাকে ছিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা গেল, কাঁধে কোদাল ও বগলের নীচে টুকরী লইয়া সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মাওলানা ব্যারাকের দিকে ফিরিয়া আসিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া জ্ঞান-পিপাসু জেলারের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি অগ্রসর হইয়া মাওলানার হাত হইতে কোদাল ও টুকরী ফেলিয়া দিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ হায়, যে হাতের স্পর্শ পাইয়া সোনার কলম ধন্য হইত, সেই হাতেই কিনা আজ টুকরী-কোদাল উঠিয়াছে! সেইদিন হইতে মাওলানাকে কায়িক শ্রম হইতে অব্যাহতি দান করিয়া লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়। গুণগ্রাহী ইংরেজ জেলার মাওলানার মুক্তির জন্যও বিশেষভাবে সরকারের

নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। এইদিকে মাওলানা আবদুল হক ও মাওলানা শামসুল হক খায়রাবাদী পিতার মুক্তির জন্য বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের তরফ হইতেও সরকারের নিকট বারবার মাওলানার মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন পেশ করা হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৬১ খৃস্টাব্দে মাওলানার মুক্তির আদেশ হইল। মাওলানা শামসুল হক আদেশটি হাতে লইয়া আন্দামান রওয়ানা হইলেন। অভিশপ্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, একটি জানাযা লইয়া যাওয়া হইতেছে। তার পশ্চাতে যেন সমস্ত আন্দামানের জনসাধারণ একত্র হইয়া শোক মিছিল করিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন যে,উহা মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীর জানাযা। শেষ পর্যন্ত মাওলানা শামসুল হকও শোকসন্তপ্ত জনতার মিছিলে শরীক হইলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অমূল্য নিধি আন্দামানের অভিশপ্ত দ্বীপে সমাহিত করিয়া দেশে ফিঁরিয়া আসিলেন।

'আস্‌সাওরাতুল-হিন্দিয়া' পুস্তকটির পাঠোদ্ধারকরতঃ উহার কতকগুলি নকল প্রস্তুত করিয়া গোপনে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। উপমহাদেশের সংগ্রামী আলেম সমাজ, বিশেষতঃ দারুল-উলূম দেওবন্দের আলেমগণ পুস্তিকাটির বিপুল সংখ্যক নকল করিয়া প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিশেষ আগ্রহে মাওলানা আবদুশ শাহেদ খান শিরওয়ানী পুস্তকটির উর্দূ অনুবাদ করেন এবং বিজনুরের বিখ্যাত উর্দূ অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মদীনার' স্বত্বাধিকারী মৌলবী মজীদ হোসাইন মূল আরবীসহ পুস্তকটি প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য যে, পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় এবং প্রকাশক ও অনুবাদককে অনেক নির্যাতন ভোগ করিতে হয়।

মৌলবী মজীদ হোসাইন কর্তৃক প্রকাশিত 'আস্‌সাওরাতুল-হিন্দিয়া' বা 'বাগী হিন্দুস্তান' নামক সেই বাজেয়াপ্ত পুস্তকটির এক কপি আমাদের পারিবারিক পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। আমাদের অগ্নিক্ষরা ইতিহাসের একটি অধ্যায় স্মরণ করার লক্ষ্য নিয়া উহার বাংলা তরজমা পেশ করা হইল। পুস্তকটি ১৮৫৭ সনের মুক্তি সংগ্রামের একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দলীল। সুতরাং বাংলা ভাষায় ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

– মুহিউদ্দীন খান

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

আমার সমস্ত প্রশংসাবাদ সেই শক্তির উদ্দেশ্যে যাঁহার সকাশে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীতই সকল বিপদ, সকল দুশ্চিন্তা, সকল ক্লান্তি ও সকল নৈরাশ্যের কবল হইতে মুক্তি লাভের সুনিশ্চিত আশা রহিয়াছে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার মহান নামে তাঁহাকে আহবান করে, তাহাকে তিনি অভাবিতপূর্ব অনুগ্রহ বিতরণ করেন। সবিশেষ যদি কেহ অত্যাচারিত হইয়া তাহার শরণাপন্ন হয় বা রুগ্নাবস্থায় তাঁহার প্রতি আকাঙ্ক্ষার হস্ত প্রসারিত করে তবে তিনি সেই আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ করিয়া থাকেন।

সালাম জানাই সেই পূতপবিত্র আত্মার প্রতি-যিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন সুসংবাদ ও সাবধানবাণীর কথা। আর যাহার আগমনের খোশখবর শুনাইয়াছেন পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ। বিপদমুক্তি, শত্রুর ষড়যন্ত্রজাল হইতে আত্মরক্ষা, সীমাহীন দুর্ভাগ্য এবং রোগ-শোকের কবল হইতে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে অনেক গুনাহগারের পক্ষেও তাঁহার শাফায়াতের বিশেষ আশা রহিয়াছে।

সালাম জানাই তাঁহার পূতপবিত্র বংশধরগণের প্রতি আর তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি–যাহারা ছিলেন অতুলনীয়, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতায় অনুপম। বিশেষতঃ তাঁহার পবিত্রাত্মা সাহাবীগণের প্রতি সালাম। আল্লাহর রহমত ও বরকত তাঁহাদের প্রতি সেই পর্যন্ত অনবরত বর্ষিত হউক, যে পর্যন্ত আসমানের ফেরেশ্তাগণ তাসবীহ্ পাঠ করিবে আর সমুদ্রের বুকে ভাসিবে কিশতির বহর।

আমার এই পুস্তক এমন এক ভগ্নহৃদয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও আক্ষেপ-সর্বস্ব ব্যক্তির বিলাপ-লিপি, যাহার এখন সামান্যতম কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তিও অবশিষ্ট নাই। এমতাবস্থায় সেই বিপদগ্রস্ত বান্দা তাহার মহান প্রতিপালকের নিকট মুক্তির আশা পোষণ করে, যে ব্যক্তি জীবনের প্রথম হইতে সর্বসুখে প্রতিপালিত হইয়া এমন জীবনের শেষ পর্যায়ে যুলুমের শিকারে পরিণত হইয়াছে। সে আজ চিরবন্দী, সর্বস্বান্ত। এই বিপদগ্রস্ত বান্দা এখন আল্লাহর মকবূল নেক দোয়ার ওসীলায় এই অস্বাভাবিক দুর্দশার কবল হইতে মুক্তি পাইতে চায়।

সত্যই আমি আজ কল্পনাতীত দুর্দশায় পতিত এবং কুৎসিত দর্শন যালিমদের হাতে বন্দী। এই যালিমরা আজ আমাকে সাধারণ ভদ্র-জনোচিত পোশাক হইতেও বঞ্চিত করিয়া সর্বপ্রকারের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের এক বিরামহীন মহড়ার শিকারে পরিণত করিয়াছে। হাঁ, আজ আমি জালিমদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ও সর্প-সরীসৃপ সংকুল যিন্দানখানায় বন্দী।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত-হৃদয় বন্দী আমি। আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা আজ অন্ধকারার নিষ্ঠুর প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে মাথা ঠুকিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এইসব হৃদয়হীন অসভ্য যালেমের আচার-ব্যবহার দেখিয়া মুক্তির আলো আর কোনদিন দেখিতে পাইব সে আশা চিরতরে ছাড়িয়া দিয়াছি। তবে আল্লাহর অনন্ত অনুগ্রহ-সাগরের একবিন্দু বারিধারা হইতে আমি নিরাশ নই। রুগ্ন, দুর্বল, শান্তি-প্রিয় এবং একজন সরল-সহজ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ আমি দুরাত্মা যালিমের কারাগারে বন্দী। এইসব দুরাত্মা ও হীন প্রকৃতির লোকগুলির নিত্য-নতুন অত্যাচার-উৎপীড়নে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। আমি এমন বিপদের মধ্যে পতিত হইয়াছি যাহা কোন কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সত্য সত্যই আজ আমি পরমুখাপেক্ষী, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। লালমুখ, কটাচক্ষু সাদা চামড়া ও পিংগলবর্ণ কেশ বিশিষ্ট এইসব যালিমের হাতে পতিত হওয়ার পরই আমার রুচিসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া আমাকে খাটো, মোটা ও জঘন্য ধরনের পোশাক পরিধান করিতে দেওয়া হইয়াছে। কারাবন্দীর পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই আমি শ্বাপদ বৃশ্চিকপূর্ণ অন্ধকার কারাগারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত ও দুঃখ-কষ্টের সীমাহীন এক প্রান্তরে শৃংখলিত। আজ আমি কর্তব্য বুদ্ধিহীন। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আশার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছি। আজ আমি আমার আত্মীয়, বন্ধু ও প্রিয়জনদের নিকট হইতে বহুদূরে।

মোকদ্দমা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন প্রকার সুযোগ না দিয়াই আমার সম্পর্কে এহেন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিচিতি বন্ধুজন এমনকি অধীন সেবক শ্রেণীর সম্মুখেও আমি আজ চরমভাবে লাঞ্ছিত। অত্যাচার করিয়া আমার দুইটি হাতই প্রায় বেকার ও দুর্বল করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। একাকিত্বের জীবনে প্রতিমুহূর্তে পরিবার-পরিজন, জন্মভূমি ও বিষয়সম্পত্তির বেদনাময় স্মৃতির বিড়ম্বনাই সার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্ভব-অসম্ভব সকল প্রকার নিপীড়নের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে ও আমার পরিজনকে নিস্তার দেওয়া হয় নাই। নিষ্ঠুর কারার অন্তরালে এমন কোন অত্যাচার নাই, যাহা আমার উপর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। কেন আমার প্রতি এই উৎপীড়ন? কিইবা আমার অপরাধ? আমার একমাত্র অপরাধ, আমি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তদুপরি লোকে আমাকে একজন আলেম বলিয়া মনে করে। আর এলমে-দ্বীনের সহিত আমার আত্মার সম্পর্ক।

এই আচরণের গূঢ় তাৎপর্য হইল, এই যালেমরা আমার প্রিয় জন্মভূমি হইতে এলেম ও এলমে-দ্বীনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলিতে চায়। দ্বীনের শিক্ষা ও প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারকে ইহারা হীন প্রতিপন্ন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৮৫৮ সালের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হইতে সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশের প্রতিটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ উজাড় হইয়া গিয়াছে, মানুষের উপর নামিয়া আসিয়াছে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের অনন্ত অভিশাপ। সেই ঘটনার উত্তরফল হিসাবে এই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের ভাগ্যাকাশে আসিয়া জমা হইয়াছে দুশ্চিন্তার মেঘ। আর সেই মেঘ হইতে একের পর এক বিপদের বজ্ররাশি পতিত হইতেছে সেই নিরীহ দেশবাসীরই মাথায়। তাহারই দরুন দেশের যাহারা শাসক ছিলেন তাঁহারা আজ পথের ফকীর, আমীর আজ কাঙ্গাল, বাদশাহ গোলাম ও জনসাধারণ পরমুখাপেক্ষীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

এই দেশের ভাগ্যে দুঃখের এই কাহিনী শুরু হইয়াছে হিংসুক বিধর্মী নাসারাদের এক গভীর কু-মতলবের পরিণতি হিসাবে। তাহারা এই দেশের শহর-বন্দর, মাঠ-ময়দান সবকিছু দখল করার পরও এই দেশবাসীর প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। এই দেশের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান লোকদিগকে এক এক করিয়া এমন দুর্দশার মধ্যে পতিত করিতে শুরু করে, যাহাতে কুশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ একটু প্রতিবাদ জানাইবার জন্য মাথা তুলিবার মতও আর কেহ অবশিষ্ট না থাকে। শেষ পর্যন্ত তাহারা এই দেশের ছোট-বড়, আমীর-ফকীর এবং

শহর ও পল্লীর সকল লোককেই খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চিরস্থায়ী করার এক হীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহাদের ধারণা ছিল যে, এই দেশের নিরীহ অধিবাসীদিগকে এই ষড়যন্ত্রজাল হইতে রক্ষা করার জন্য কেহই আগাইয়া আসিবে না। সুতরাং সরলভাবে তাহাদের সেই ষড়যন্ত্রের জালে ধরা দেওয়ার পরিবর্তে কেহই অবাধ্যতা প্রকাশ করিতে সাহসই করিবে না। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এই দেশের সকল ধর্মাবলম্বীকে খৃস্টধর্মের মাধ্যমে একটা মাত্র অনুগত জাতিতে পরিণত করাই ছিল উহাদের শেষ লক্ষ্য। তাহারা খুব ভালভাবেই এই কথা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, এই দেশবাসীর ধর্মীয় বোধ এবং এই নতুন শাসক শ্রেণীর ধর্মীয় বোধের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাহা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য করিয়া তুলিবে এবং অবশেষে সে সংঘর্ষ বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে পরিণত হইবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া শাসক শ্রেণী সর্বপ্রকার ধর্মীয় চেতনার বিলুপ্তি সাধন করার জন্য নানা প্রকার জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। উহারা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিশুশিক্ষার নামে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা ও তামাদ্দুন শিক্ষাদানের জন্য অসংখ্য মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে শুরু করে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের প্রাচীন মক্তব, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি ধ্বংস-করার কার্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকে।

শিক্ষা ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় চাষীদের নিকট হইতে তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাধ্যতামূলকভাবে খরিদ করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিযুক্ত মওজুদদারদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও করে তাহারা। ফলে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছামত মূল্য আদায় করার একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা মওজুদদারদের হাতে চলিয়া যায়। নিরুপায় দেশবাসী যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদতলেই আশ্রয় ভিক্ষা চায়, সেই অসদুদ্দেশ্যই উপরোক্ত ব্যবস্থার পশ্চাতে ক্রিয়া করিতেছিল। খাদ্যাভাবে নিষ্পিষ্ট জনসাধারণ যাহাতে শেষ পর্যন্ত খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ও তাহাদের অনুচরদের যেকোন নির্দেশ মান্য করে এবং তাহাদের যেকোন অন্যায় অভিলাষের সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিতে রাজী হয় এই

ছিল নতুন শাসক শক্তির দুরভিসন্ধি। উপরোক্ত হীন পন্থাসমূহ অবলম্বন করা ব্যতিরেকেও তাহাদের অন্তরে আরো বহু কু-মতলব লুক্কায়িত ছিল। যেমন মুসলমানদিগকে তাহারা খত্না করাতে নিষেধ করে। পর্দানশীল শরীফ যেনানাগণকে বেপর্দা ও বেহায়া করিয়া তোলার জন্য নানা ধরনের প্রভাব বিস্তার এবং সরকারী চাপ প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার পন্থা অবলম্বন করে। এইভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটি হুকুম-আহকাম গুরুত্বহীন করিয়া প্রদর্শনের চেষ্টা চলিতে থাকে।

খৃষ্টান শাসক শ্রেণী সর্বপ্রথম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজ শুরু করে। এই দেশবাসী হিন্দু-মুসলিম সৈনিকদিগকে তাহাদের স্বকীয় আচার-আচরণ, ধর্মকর্ম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস হইতে দূরে সরাইতে নানা পন্থা অবলম্বন করে। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল এই যে, দেশের সাহসী বীর সৈন্যবাহিনীকে যদি তাহারা নানা প্রকার কলা-কৌশলের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দেশের সাধারণ মানুষকে বল প্রয়োগের দ্বারাই ধর্মান্তরিত করা সহজ হইয়া যাইবে। সরকারী শাস্তির ভয়ে এই ব্যাপারে আর কেহ কোন উচ্চবাচ্য করিতেও সাহসী হইবে না। সর্বপ্রথম তাহারা হিন্দু সৈন্যবাহিনীতে যাহারা ছিল সংখ্যায় অধিক; তাহাদের খাদ্যতালিকায় গরুর চর্বি এবং স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের জন্যে শূকরের চর্বি প্রচলন করার জন্য তোড়জোড় শুরু করে। এই লজ্জাকর হঠকারিতার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহারা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকরতঃ সরকারী আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে শুরু করে। বিক্ষোভ ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতে থাকে। কোন কোন স্থানে সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ খৃস্টান কর্মচারী হত্যা, বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ, সরকারী ভাণ্ডার লুণ্ঠন, বেপরোয়া আচরণ প্রভৃতি নানারূপ বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতে শুরু করিল। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদিগকে সপরিবারে হত্যা এমনকি শেষ পর্যন্ত স্ব-স্ব ছাউনি আক্রমণ করিয়া তাহারা চতুর্দিকে বিদ্রোহের আগুন দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া দিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্ব-স্ব ছাউনি ছারখার করিয়া তাহারা শহর-বন্দরে চলিয়া আসিল। বিদ্রোহী সৈন্যদের বেপরোয়া চলাফেরার ফলে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। শহর-বন্দর ছাড়াইয়া সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র অশান্তির আগুন বিস্তৃত হইল। এই সুযোগে দেশের

দুষ্কৃতকারী শ্রেণী বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিল। দেশময় শুধুমাত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর অনেকেই মোগল বাদশাহদের কর্মকেন্দ্র সুবিখ্যাত দিল্লী নগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা এমন এক ব্যক্তিকে তাহাদের নেতা বলিয়া ঘোষণা করিল, যে ব্যক্তি ইতোপূর্বেও তাহাদের বাদশাহ ছিলেন। তখন পর্যন্ত তাঁহার নামেমাত্র বাদশাহীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এমনকি তাহার উজিরসভা, আমীর-উমারা প্রভৃতি সবকিছুরই অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং ছিলেন দুর্বল, ভগ্নহৃদয় এবং সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত জীবনচক্রযানে অনেকগুলি মনযিল পাড়ি দিয়া তিনি বার্ধক্যের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিয়া ছিলেন। তদুপরি প্রকৃতপক্ষে তিনি শাসনকর্তা ছিলেন না, তাঁহারা সরলমতী স্ত্রী ও ষড়যন্ত্রকারী উজিরের শাসনাধীন ছিলেন মাত্র। তাঁহার এই উজির ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ নাসারাদের উৎকোচভোগী চর। বাদশাহের প্রতি কোন প্রকার আনুগত্যই উজিরের অন্তরে ছিল না। উপরন্তু গোপন মনিব ইংরেজদের প্ররোচনায় প্রভাবিত এই উজির ছিলেন দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের প্রথম শ্রেণীর শত্রু। দিল্লীর এই শাসনকর্তার পরিবারস্থ অন্যান্য লোকদের অবস্থাও স্বতন্ত্র ছিল না। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাদশাহর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রও ছিল। কিন্তু উহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মূর্খতা, অকর্মণ্যতা এবং ষড়যন্ত্রকারীরূপে। তাহারা যদৃচ্ছা কাজ করিত। প্রবৃত্তির তাড়না ব্যতীত তাহারা কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিত না। কিন্তু মুখে মুখে সকলেই বাদশাহের আনুগত্যের নামে গদগদ হইয়া পড়িত। কিন্তু এই সমস্ত বুঝিবার ক্ষমতাও বাদশাহের ছিল না। তিনি এত অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, নিজের বুদ্ধিতে কোন সাধারণ বিষয়ের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। নীরবে কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া অন্য কিছু করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। কাহাকেও নির্দেশ প্রদান কিংবা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে একদল সাধকশ্রেণীর আলেম জেহাদের ফতওয়া প্রচার করিলেন। তাঁহারা যেমন আলেম ও সাধক ছিলেন, তেমনি ছিলেন নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ। ফতওয়া প্রচার করিয়া তাঁহারা দিল্লীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। পূর্বের জেহাদী আন্দোলনের সঙ্গে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান বীর পুরুষ

যুক্ত ছিলেন তাঁহারাও সেই সঙ্গে আসিলেন। এই সময় দিল্লীর অনভিজ্ঞ শাসনকর্তা সাধক আলেম ও বীর মোজাহেদ বাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার পরিবারের কতিপয় মূর্খ, কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক নির্বোধ শ্রেণীর লোককে সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব দান করিয়া বসিলেন। এই সমস্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক প্রকৃত ধর্মভীরু সাহসী ও নিষ্ঠাবান লোকদিগকে দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িল।

এই তথাকথিত সেনানায়করা যুদ্ধ কাহাকে বলে তাহাও জানিত না; অস্ত্র চালনা বা শত্রুর মোকাবেলা করার কোন অভিজ্ঞতাই তাহাদের ছিল না। তাহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন নীচ প্রকৃতির লোকদিগকে তাহাদের পরামর্শদাতা ও মোসাহেবরূপে গ্রহণ করিল। বস্তুতঃপক্ষে তাহারা সংগ্রাম পরিচালনার পরিবর্তে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও নানা প্রকার ইতরোচিত পাপানুষ্ঠানে নিমগ্ন হইল।

পূর্বে তাহারা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন-যাপন করিতেছিল। এই সুযোগে হঠাৎ তাহাদের হাতে প্রচুর সম্পদ আসিয়া জমা হইতে লাগিল। সম্পদ হাতে পাইয়াই উহারা ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া গেল। দেশবাসী তাহাদিগকে সংগ্রামের জন্য অর্থ প্রদান করিয়াছিল। কোন কোন স্থান হইতে তাহারা সংগ্রামের নাম করিয়া বলপূর্বক অর্থও আদায় করিতে থাকে। কিন্তু এই অর্থের এক কপর্দকও উহারা অস্ত্র ক্রয় অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ব্যয় করিত না। যাহাই হাতে পাইত, নিজেরা গ্রাস করিত। শুধু তাহাই নয়, ব্যভিচারিণী নারীর সংসর্গ ও বাঈজীদের মোহে তাহারা সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব ভুলিয়া বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিত। রাত্রিকালে কোথাও সৈন্য পরিচালনার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সেনাপতির খোঁজ পড়িত, আর সেনাপতি পুংগব হয়ত তখন কোন নর্তকীর বিলোল নেত্রের সুধাপানে নিমগ্ন থাকিতেন। বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও ভোগ-বিলাসের মোহে অনেক সময়ই তাহারা সৈন্যবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন। সর্বোপরি উহাদের কাপুরুষসুলভ সন্দিগ্ধতা এবং ইতরজনোচিত মানসিকতার ফলে সুদক্ষ সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও উদ্যম ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হইতে পারিল না। এমনিভাবে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে হতাশা, উদ্যমহীনতা এবং চাঁপা বিক্ষোভ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। মোসাহেব প্রকৃতির নীচ শ্রেণীর পরামর্শদাতাদের প্ররোচনায় কর্ণপাত করিয়া

তাহারা গোটা সৈন্য বাহিনীকেই হীনবীর্য করিয়া তোলেন। অনুপযুক্ত অথর্বের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হইলে এবং দুর্বলের মাথায় বড় কোন বোঝা চাপাইয়া দিলে তাহার পরিণাম বুঝি এমনই হইয়া থাকে। দিল্লীর তথাকথিত সেই সেনাপতি মহোদয়েরা রাত্রি অতিবাহিত করিতেন নেশাগ্রস্ত হইয়া আর দিবাভাগে পড়িয়া থাকিতেন মদালস হইয়া। কখনও একটু চৈতন্য উদয় হইলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ছুটাছুটি করা ছাড়া তাহারা আর কিছুই করিতে পারিতেন না।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই নাসারাদের সৈন্যবাহিনী আসিয়া রাজধানীর উপকণ্ঠে আক্রমণ শুরু করিল। একটি উচ্চ পর্বতশীর্ষে সৈন্যবাহিনী স্থাপন করিয়া তাহারা শহরের চারিদিকে পরিখা খনন করতঃ অবরোধ গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইল। পাহাড়ের প্রত্যেকটি টিলার উপরে তোপ এবং প্রস্তর নিক্ষেপণযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহারা শহরের দিকে বেপরোয়া গোলা-বর্ষণ করিতে শুরু করিল। এই তীব্র আক্রমণ দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন প্রচণ্ড বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত এবং আকাশের নক্ষত্ররাজি শহরের বাড়িঘরের উপর সবেগে আসিয়া পতিত হইতেছে।

অপরপক্ষে দেশী সৈন্যবাহিনী ছিল বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। অনেক দলেই কোন প্রকার নেতৃত্ব ছিল না। অনেকের মাথা গুঁজিবার মত স্থানটুকুও ছিল না। কোন কোন বাহিনী খাদ্যাভাবে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু কিছু লোক সামান্য লুণ্ঠিত সম্পদ হাতে পাইয়াই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে না থাকিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে শুরু করিয়াছিল। কিছু সংখ্যক সৈন্য চরিত্রহীন পতিতাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথাকথিত অভিজাত সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধের মোটা পোশাক পরিধান করিয়া সৈন্যবাহিনীতে কাজ করা আভিজাত্যের পরিপন্থী মনে করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। নাসারাদের সঙ্গে বীরত্ব ও নিষ্ঠার সহিত লড়িয়া যাইতে লাগিলেন একটিমাত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রদল, ইহারা ছিলেন প্রকৃত মুজাহেদ বাহিনীর লোক। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুজাহেদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই নাসারা ইংরেজ বাহিনীর পর্যুদস্ত হইবার উপক্রম হইল। তাহারা তখন পূর্বদেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। হিন্দুরা অতি দ্রুততার সহিত তাহাদিগকে

উপর্যুপরি সৈন্য ও অস্ত্র পাঠাইতে লাগিলেন। এই নতুন সাহায্যে বলীয়ান হইয়া নাসারা বাহিনী পুনরায় তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিল। অল্পদিনের মধ্যে পর্বতোপরিস্থিত খৃষ্টান শিবিরে প্রচুর অস্ত্র, রসদ এবং সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের মধ্যে লালমুখো ইংরেজ হইতে শুরু করিয়া নিকৃষ্ট ও নীচশ্রেণীর হিন্দু ভাড়াটিয়া সৈন্য পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর মানুষই দৃষ্টিগোচর হইত। এমনকি তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দ্বীন-ঈমান বিক্রয়কারী হতভাগ্য মুসলমান নামধারী লোকও শামিল ছিল। তাহারা মাত্র কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে নাসারাদের হাতে তাহাদের দ্বীন-ঈমানরূপ অমূল্য সম্পদ বিক্রয় করিয়া বসিয়াছিল।

দিল্লী শহরের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট লোকও নানা প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া খৃষ্টানদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের হিন্দু প্রজারা মুসলমানদের অধিকাংশ লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু একটি দল খৃষ্টান দুশমনদের এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিল যে, দেশীয় সৈন্যদের ধ্বংস সাধন এবং সংগ্রামী মুজাহেদ বাহিনীর সর্বনাশ সাধনের জন্য যেকোন হীন পন্থা অবলম্বন করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত ছিল না। বিশেষতঃ মুজাহেদ বাহিনী এবং দেশীয় ফৌজের মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই ইংরেজ সৈন্যগণ বেপরোয়াভাবে শহরের বিভিন্ন প্রবেশপথে আক্রমণ শুরু করিল। নগর প্রাকারের কোথায় একটু ফাটল রহিয়াছে, কোথায় রক্ষাব্যবস্থা দুর্বল এই সমস্ত খবরই তাহাদের পৌছান হইত। কিন্তু দেশীয় সৈন্যের একটি বিশিষ্ট দল মুজাহেদ বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ পরিচালনা করিয়া যাইতেছিলেন। দিবারাত্রি অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যগণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাইতে লাগিলেন। দীর্ঘ চারি মাসকাল ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকিল, কিন্তু বিপুল সংখ্যক সৈন্য এবং যুদ্ধসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা শহরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। শত্রুরা যখনই একপদ অগ্রসর হইত, মুজাহেদ বাহিনী প্রবল বিক্রমের সহিত তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিত। তাহারা যখনই আক্রমণ করিতে আসিত প্রতি-আক্রমণের দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইত।

বীর ও বিচক্ষণ মুজাহেদ বাহিনীর লোকেরা অত্যন্ত দূরদৃষ্টির সঙ্গে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের মোকাবেলা করিতেছিলেন। কোন আক্রমণের মুখেই তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইতেন না। বরং অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু অনেকের পক্ষেই যুদ্ধে বীরের ন্যায় শহীদ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য আল্লাহপাক সৎকর্মশীলদিগকে অফুরন্ত নেয়ামত দান করিবেন বলিয়া ওয়াদা দিয়াছেন।

এইভাবে মুজাহেদ বাহিনীর আয়তন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। শহরবাসীর অসহযোগিতা এবং তথাকথিত শাসন-কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও ঔদাসীন্যের ফলে হতাশা বিশিষ্ট মুজাহেদ বাহিনীর পক্ষে নিদারুণ খাদ্যাভাবের কবল হইতে জীবন রক্ষা করাই দায় হইয়া পড়িল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাঁহারা সারাদিন যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত করিতেন এবং অভুক্ত অবস্থায়ই রাত্রিবেলা যত্রতত্র শুইয়া কাটাইয়া দিতেন। পুনরায় সকালে উঠিয়া যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের বীরত্বের ফলেই তখনও পর্যন্ত শহরের সীমান্ত রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। চতুর শত্রু সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির প্রতিও তাঁহারাই বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় দেখা দিল। একদা রাত্রিবেলা শত্রু শিবিরের নিকটবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ পথে একদল অকর্মণ্য নির্বোধ ও চরিত্রহীন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। সরকারী সৈন্যদের উপর মুজাহেদ বাহিনীর কোন কর্তৃত্বই ছিল না। তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে মুজাহেদদের কোন প্রকার পরামর্শও গ্রহণ করা হইত না। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ গিরিসংকটের মুখে কাহাদের নিযুক্ত করা হইল সেই সম্পর্কে মুজাহেদগণ কোন খবরই জানিতে পারিলেন না। রাত্রি ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া আরামে নিদ্রা যাইতে লাগিল। শত্রুবাহিনী এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিল। নিশীথের অন্ধকারে আক্রমণ চালাইয়া তাহারা সরকারী সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ গিরিসংকটটি দখল করার পর ইংরেজ সৈন্যবাহিনী শহরের অনেকটা নিকটে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হইল। তাহারা শহরের নিকটতম পর্বতটিলাগুলিতে কামান ও প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র স্থাপন করিয়া শহরের ভিতরে প্রচণ্ডবেগে গোলাগুলি ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল।

দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টিধারার ন্যায় শহরের ভিতর গোলা-বারুদ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ফলে, নগররক্ষী প্রাচীরের স্থানে স্থানে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হইল। প্রবেশপথের বুর্জ ও মিনার ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইবার আশার শেষ আলোটুকুও যেন নিভিয়া গেল। প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে দেশী সৈন্যদের পক্ষে চলাফেরা পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়িল। ভগ্ন প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কি হইতেছে তাহা উঁকি মারিয়া দেখিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কাহারও ছিল না। কেহ এইরূপ দুঃসাহস করিয়া অগ্রসর হইলে সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাচীর সংলগ্ন গভীর খাদে পতিত হইত।

এই নাযুক অবস্থার মধ্যে ইংরেজ নাসারাগণ একটি নতুন চাল চালিল। একদল সৈন্য তাহারা আক্রমণ-ভাগ হইতে সরাইয়া শহরের অন্য এক দরজার সম্মুখে নিয়া সমবেত করিল। মুজাহেদগণ মনে করিলেন যে, ইংরেজরা আক্রমণের গতি পরিবর্তন করিয়াছে। এইরূপ অনুমান করিয়াই মুজাহেদগণ কল্পিত নতুন আক্রমণ পথের দিকে চলিয়া গেলেন। এইদিকে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে খৃষ্টানরা ভগ্ন প্রাচীর ও বুর্জের ফাটল পথে বিনাবাধায় শহরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। শহরে তাহারা তাহাদের গোপন সাহায্যকারী চরদের বাড়িতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। চরেরা অতি দ্রুততার সঙ্গে শত্রুসৈন্যদের আশ্রয় ও রসদের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। উহাদিগকে উত্তম খাদ্য পরিবেশন করা হইল এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইল। প্রত্যেকের বাড়িতে ফটক বন্ধকরতঃ দেয়াল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের নল স্থাপন করা হইল। মুজাহেদ বাহিনীর প্রতিরোধ আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য সর্বপ্রকার নিরাপদ ব্যবস্থাই তাহারা অতি দ্রুততার সঙ্গে সমাপ্ত করিয়া ফেলিল। ইহার পর মুজাহেদ বাহিনীর কোন লোক এমনকি শহরবাসী কোন সাধারণ লোকও তাহাদের অস্ত্রের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করার কালে বেপরোয়া গুলিবর্ষণের মুখে পড়িত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা এক প্রকার অবরুদ্ধ জীবনই যাপন করিতেছিল। বাহিরে আসিবার কোন পথই তাদের জন্য খোলা ছিল না। আশ্রয় শিবিরগুলি হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ধরা পড়িত এবং জনসাধারণের হস্তে নিহত হইত। এইজন্য তাহারা আত্মগোপন করিয়াই দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু শহরের বাহির হইতে সর্বদা অবিরতভাবে তাদের নিকট সাহায্য আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। শহরের অমুসলিম অধিবাসীরাও গোপনে আত্মগোপনকারী শত্রুসৈন্যদিগকে সাহায্য করিয়া যাইতেছিল।

এই পরিস্থিতির ফলে ধীরে ধীরে মুজাহেদ বাহিনীর সম্মুখে সংকট বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। শহরের কোন স্থানেই মুজাহেদদের জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয় অবশিষ্ট রহিল না। সর্বত্রই ষড়যন্ত্রকারী শত্রুর চরেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শহরের শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দেশের শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত বৃদ্ধ বাদশাহ তাঁহার প্রাসাদ ছাড়িয়া তিন মাইল দূরবর্তী হুমায়ূনের মাকবারায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃদ্ধ বাদশাহের নিজস্ব কোন মতামত ছিল না। তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উজির এবং তরলমতি বেগমের হাতে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করিতেছিলেন মাত্র। দুরাত্মা উজির বাদশাহকে এইরূপ বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিল যে, ইংরেজগণ শহর জয় করিয়া লইলেও তাঁহার মর্যাদার কোনই হানি হইবে না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাঁহাকেই দিল্লীর শাহানশাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। সরলপ্রাণ বৃদ্ধ বাদশাহ বিশ্বাসঘাতকদের সেই কথাতেই আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। বাদশাহের পিছনে পিছনে দরবারের আমীর-উমারা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র সবকিছু ত্যাগ করিয়া হুমায়ূনের মাকবারায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই বাড়িঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার ফলে শহরের সাধারণ জনসাধারণও দ্রুত ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করিতে শুরু করিল।

এইভাবে শহর এক প্রকার জনশূন্য হইয়া যাইবার পর ইংরেজ সৈন্যরা দ্রুত যাইয়া পরিত্যক্ত বাড়িঘরে প্রবেশ করিতে শুরু করিল। তাহারা এই শূন্যপ্রায় শহরটিতে প্রাণ ভরিয়া লুটপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল। শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের মধ্যে যাহারা তখন পর্যন্ত অন্যত্র পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ইংরেজরা নির্বিচারে হত্যা করিয়া যাইতে লাগিল। শহরে তখন এমন একজন সাহসী পুরুষও অবশিষ্ট ছিল না, যিনি এই সীমাহীন নির্যাতনের সম্মুখে ক্ষণিকের জন্য হইলেও রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন।

অপরদিকে বিদ্রোহী সৈন্যদের কিছু সংখ্যক পরিস্থিতি নাযুক দেখিয়া পূর্বাহ্নেই সরিয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা সংঘবদ্ধ ইংরেজ বাহিনী এবং বিপুল অস্ত্রসজ্জিত দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সম্মুখে বেশী সময় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অনেকেই ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময় হিন্দু বানিয়া সম্প্রদায়, বাদশাহের বিশ্বাসঘাতক আমীর-উমারা এবং মুজাহেদ বাহিনীর শত্রুরা সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিতে শুরু করিল। বেনিয়ারা শহরের সমস্ত মওজুদ খাদ্যশস্য গুদামজাত করিয়া রাখিল। বাহির হইতে যে শস্য আমদানী হইত, তাহাও বাধাগ্রস্ত হইল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে মুজাহেদ বাহিনীর লোকজন এবং নগরবাসিগণ এক দারুণ সংকটের সম্মুখীন হইলেন। মুজাহেদ বাহিনী ও দেশপ্রেমিক শহরবাসিগণ দিনের পর দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি নানা সংকটের কবলে পতিত হইয়া দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সংকটের মুখে কেহই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াই ইংরেজ নাসারা বাহিনী শহরের প্রাচীর ও তোরণগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিল এবং বন্যার স্রোতের ন্যায় শহরে প্রবেশ করিতে শুরু করিল। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় নাসারাদের হাতে দিল্লীর পতন হইল।

এই সংকটজনক সময়ে আমার পরিবার-পরিজনের অনেকেই দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিল্লীবাসীদের বেশকিছু সংখ্যক লোক এই সময় আমার পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। আমিও সাফল্যের আশা লইয়া দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যাহা কিছু হওয়ার ছিল, পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। আমি দিল্লী পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম পরিবার-পরিজনের সহিত সাক্ষাত করিলাম। আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা মোতাবেক লোকদিগকে পরামর্শ দান করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার পরামর্শে প্রায় কেহই কর্ণপাত করিলেন না। আমার কথা শুনিতেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না।

ইংরেজ সৈন্যরা শহর দখল করিবার পর মুজাহেদ বাহিনীর কোন লোক অথবা স্বাধীনচেতা কোন নাগরিকই আর শহরে রহিলেন না। যালেমরা চারিদিকে এমন এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করিল যে, শহরের খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় পাঁচদিন পাঁচরাত্রি অবস্থান করার পর আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু পুস্তকের ভাণ্ডারটিসহ অন্যান্য সর্বপ্রকার আসবাবপত্র পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া পরিবার-পরিজনসহ শহর ত্যাগ করিয়া চলিলাম। অন্ততঃ পুস্তকগুলি বহন করার মত কোন যানবাহনের ব্যবস্থাও আমি করিতে পারিলাম না।

শহর দখল করতঃ এই সমৃদ্ধ জনপদের ধন-সম্পদ এবং আমীর-উমারাদের বাড়িঘর হস্তগত করার পর শ্বেতাংগ নাসারা গোষ্ঠী সর্বপ্রথম বাদশাহ এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততিকে গ্রেফতার করার প্রতি মনোযোগী হইল।

হতভাগ্য বাদশাহ সপরিবারে তখন হুমায়ূনের মাকবারাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উজিরেরা তখন পর্যন্ত তাঁহার কানে আশার বাণী শুনাইতেছিল। তিনি তাহাদের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বাদশাহী চালে তখনও পর্যন্ত চাকর-বাঁদীর সেবাযত্ন উপভোগ করিয়াই দিন গোজরান করিতেছিলেন।

কিন্তু হায়, বিশ্বাসঘাতকের কথায় কর্ণপাত করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা সেই বাদশাহকেই শেষ পর্যন্ত সীমাহীন লাঞ্ছনা, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনার সহিত সপরিবারে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় শহরের দিকে আসিতে হইল। পথিমধ্যে 'হাডসন' নামক এক সেনানায়ক বাদশাহ-তনয় ও পৌত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করিল । এইভাবে মির্জা মুগল এবং খেজের সুলতানের জীবন অবসান হইল। যালেমেরা শাহাজাদাদ্বয়ের মৃতদেহ পথিপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া মস্তক কর্তন করিয়া আনিল এবং একটি সুসজ্জিত পাত্রে স্থাপন করতঃ বাদশাহের সম্মুখে 'উপহার' স্বরূপ পেশ করিল । তৎপর মস্তক দুইটিও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

তৎপর মসিবর্ণ অন্তর শ্বেতকায় ও পিংগলবর্ণ কেশবিশিষ্ট জালেম ইংরেজরা বাদশাহকে সূঁ ইয়ের ছিদ্র সদৃশ একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখে। এই বিশাল দেশের কোন এক কোণেও তাঁহার জন্য একটু স্থান করিয়া দেওয়ার মত উদারতাও ইহারা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দেশের বাহিরে একটি উপদ্বীপ এলাকায় (ব্রহ্মদেশে) নির্বাসিত করে।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যে বেগম বাদশাহের প্রধান মন্ত্রণাদাত্রী থাকার সময় ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়াছিল এবং স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী করিয়া লওয়ার জন্য সর্বাবস্থায় দেশ ও জাতির শত্রু ইংরেজ সৈন্যদিগকে গোপনে সাহায্য দান করিত, তাহার মিথ্যা আশার সৌধও মুহূর্তের মধ্যেই ধসিয়া পড়িল। সর্বপ্রথম

গোরা সেনানায়কগণ তাঁহার সঞ্চিত সকল ধন-সম্পদ কাড়িয়া লইল। তৎপর তাঁহাকেও বাদশাহের সহিত নির্বাসনে প্রেরণ করা হইল। তিনি ছিলেন 'যিনাত-মহল' বা মহলের সৌন্দর্য। ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ তাঁহাকে কুৎসিততম একটি ঘৃণ্য নারীতে পরিণত হইতে হইল।

মনুষ্যত্ব বিবর্জিত ইংরেজ যালেমরা বাদশাহের পরিবার-পরিজনের যাহাকেই হাতে পাইত নির্বিচারে হত্যা করিত অথবা অন্যান্য অসংখ্য দেশপ্রেমিক নাগরিকের ন্যায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইত। এই দুর্বল হতভাগ্যদের মধ্যে যাহারা রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া অথবা দিনের বেলায় গোরা সৈন্য এবং দেশী বিশ্বাসঘাতকদের চক্ষে ধুলা নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইল, তাহারাই কেবলমাত্র বাঁচিয়া রহিল। অবশ্য এই শ্রেণীর ভাগ্যবান খুব কমই ছিল।

তৎপর গোরা খৃষ্টান সৈন্যরা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমীর-উমারা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধন-সম্পদ, বাড়ি-ঘর, উট, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুই লুণ্ঠন করিতে শুরু করিল। তাহাদের হাতী, ঘোড়া, উট, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু ইংরেজ শিবিরে আনিয়া জমা করিতে লাগিল। এত করিয়াও তাহারা নিরস্ত্র হইল না, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের পর্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করিতে লাগিল । অথচ উহারা সকলেই শান্তভাবে ইংরেজ শাসকের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। পরে ভয়ে অথবা স্বার্থের লোভে ইংরেজদের সাহায্যকারী হইবারও সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় ছিল।

অতঃপর ইংরেজ নাসারা গোষ্ঠী চতুর্দিকের প্রত্যেকটি বড় রাস্তার পার্শ্বে সৈন্য মোতায়েন করিয়া দিল, যাহাতে প্রত্যেকটি পলায়নকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করিয়া তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করা সম্ভব হয়। অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই নিষ্ঠুরদের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। অবশিষ্ট সমস্ত লোককে গ্রেফতার করিয়া আনা হয়। গ্রেফতারকৃত এই সমস্ত হতভাগ্যদের নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি যাহা কিছু থাকিত সবকিছু ছিনাইয়া লওয়া হইত। তৎপর বন্দীদের জামা, কাপড়, চাদর, লুঙ্গি, পায়জামা যা কিছু পরিধানে থাকিত, সবকিছুই খুলিয়া নেওয়া হইত। সর্বশেষে তাহাদিগকে সেনানায়কদের সম্মুখে পেশ করা হইত। সেনানায়কগণ এই সমস্ত লোককে গুলি করিয়া হত্যা অথবা ফাঁসির নির্দেশ দিত। যুবা-বৃদ্ধ, ইতর-ভদ্র, সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি একই ব্যবহার করা হয়। এই ভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে

আত্মদানকারী অথবা গুলির সম্মুখে প্রাণ ত্যাগকারীর সংখ্যা হাজার-হাজারের কোঠায় যাইয়া দাঁড়ায়। যালেমদের এই বর্বর নির্যাতনের যাহারা শিকার হয়, তাহাদের অধিকাংশই ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমান নাগরিক।

হিন্দুদের মধ্যে মাত্র তাহারাই নিহত হয়, যাহাদের সম্পর্কে জানা ছিল যে, তারা প্রকাশ্য শত্রুতা করিয়াছে বা মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাইয়াছিল, যাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, অথবা দ্বীন-ঈমান পরিত্যাগ করতঃ নাসারা দস্যুদের সহায়তা করিয়াছিল; আর যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা পশ্চাতে ফেলিয়া নাসারা শত্রুদের গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এই দুরাত্মাদের মধ্যে বাদশাহের এক বিশিষ্ট অমাত্যও শামিল ছিল (হাকীম আহসান উল্লাহ খাঁ)। খৃষ্টান আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে এই লোকটার প্রচেষ্টার কোন সীমা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার সকল আশা মরীচিকায় পরিণত হয়। আশা ভঙ্গের গ্লানি এবং স্বজাতিদ্রোহিতার আক্ষেপ শেষ জীবন পর্যন্ত তাহাকে মর্মে মর্মে দাহন করে। তাহার অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং জনসমাজে ঘৃণ্য ও ধিকৃত একটি লোক হিসাবে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার চাইতে বড় সর্বনাশ আর কি হইতে পারে?

এই গণহত্যার পৈশাচিকতা শুধু দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চতুর্দিকে হিন্দু জমিদার ও অমাত্যশ্রেণীর নিকট নির্দেশনামা প্রচার করিয়া দিল যে, যে কোন সন্দেহজনক লোককে গ্রেফতার করিয়া যেন দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। এই নির্দেশের ফলে হাজার হাজার পলায়নকারী দেশপ্রেমিক গ্রেফতার হয় এবং গণহত্যার শিকারে পরিণত হয়। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা কোন সাধারণ লোকের পক্ষেই এই অভিযানের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

অতঃপর দেশের প্রতি প্রান্তে উন্মত্ত সৈন্যবাহিনীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইসব রক্তপিপাসু হায়েনার দল লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং নানা অকল্পনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে সমগ্র দেশে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে।

এই মহাবিপদের দিনে শরীফ পর্দানশীন যানানাগণও প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে থাকেন। বৃদ্ধ, দুর্বল, শিশু এবং অনভ্যস্ত পুর-নারীরা অনেকেই পথ

চলার শ্রান্তি ও ভীতির ফলে প্রাণত্যাগ করেন। অনেকেই আবার মান-সম্ভ্রম বিপন্ন মনে করিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসেন। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোককে গ্রেফতার করিয়া বর্ণনাতীত নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। অনেক বিশিষ্ট লোকের কন্যাকেও যালেমরা সেবাদাসী বা রক্ষিতার জঘন্য জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কত শরীফ ঘরের মা-বোনকে যে ইহারা গরু-ছাগলের ন্যায় হাটে-বাজারে বিক্রয় করে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই লাঞ্ছনার সময় অনেকেই মৃত্যুর কবলে ঢলিয়া পড়ে। কত নারী ও শিশু যে নিখোঁজ হয়, তাহার কোন হিসাব নাই।

কত নারী, শিশু ও বৃদ্ধ লাচার লোক যে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্বনাশের কবলে পতিত হয়, তাহার হিসাবই বা কে জানে? এই মহাবিপদের সময় চারিদিকেই যেন কেয়ামতের দৃশ্য পরিলক্ষিত হইত। কেয়ামত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সেইদিন পিতা তার সন্তান, স্বামী তার স্ত্রী, সন্তান তার পিতামাতা ইত্যাদি কেউ কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় পাইবে না। চারিদিকে কেবল বিভীষিকার রাজত্বই পরিলক্ষিত হইবে। সকলেই কেবল আত্মরক্ষার চিন্তায় অধীর থাকিবে। পিশাচের দোসর ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখে এই দেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়ে। সকাল বেলায় হয়ত যে নারী ছিল স্বামী-পুত্রের সংসারের রাণী, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে না আসিতেই সে হইল নিঃসহায় বিধবা এবং কড়ার ভিখারী। যে সন্তান হয়ত রাত্রির বেলায় পিতার কোলে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, সকাল হইতে না হইতেই দেখা গেল সে অনাথ এতীমে পরিণত হইয়াছে।

এই ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও বিভীষিকার রাজত্বে চারিদিকে কেবল শ্রুতিগোচর হইত সন্তানহারা দুঃখী জননীর বিলাপধ্বনি। পুরুষদের পক্ষেও আত্মীয়-বন্ধু ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের বিরহে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেকালের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরগুলি যেন বৃক্ষলতাহীন শুষ্ক মরুপ্রান্তরে পরিণত হইল। শহরের সচ্ছল-সুখী অধিবাসিগণ সর্বস্বান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এককালের সমৃদ্ধ দিল্লী ধ্বংস ও বিভীষিকার শহররূপে পড়িয়া রহিল।

দিল্লী ধ্বংস করিবার পর ইংরেজরা পূর্বদেশীয় শহর ও জনপদগুলির দিকে মনোযোগ দিল। সেই সমস্ত শহরেও দেখিতে না দেখিতেই ব্যাপক

ধ্বংসলীলা নামিয়া আসিল। ব্যাপক গণহত্যা ও বেপরোয়া লুণ্ঠন চলিল এবং ইংরেজ সেনারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিককে ধরিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে লাগিল। অগণিত মানুষ গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিল।এহেন শোচনীয় পরিস্থিতিতেই আমি আমার জন্মস্থান খায়রাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পথ ছিল পদে পদে ভীতি ও বিঘ্নসংকুল। এই পথে যাহারা অগ্রসর হইতেছিলেন তাহাদের কাহারও সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি তখন অবশিষ্ট ছিল না। পথে কয়েকটি স্থান খুবই বিপদসংকুল ছিল। নাসারা ও তাহাদের সাহায্যকারী সৈন্যরা পথের ধারে ধারে তল্লাশী ঘাঁটি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। হিংস্র প্রকৃতির জাঠদিগকে যেকোন পথচারীকে লুণ্ঠন করা, মারপিট করা এমনকি হত্যা পর্যন্ত করিয়া ফেলিবার সাধারণ অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দস্যু সম্প্রদায় এতদূর উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পথে পথে ছাউনি ফেলিয়া তাহারা পলায়নপর পথিকের অপেক্ষা করিত, প্রত্যেকটি খেয়াঘাটে নৌকা আটক করিয়া লুণ্ঠনের পথ সুগম করিয়া লইত। নৌকাযোগে কোন লোককে যাইতে দেখিলে সেই নৌকায় অগ্নিসংযোগ করা হইত অথবা ভাঙ্গিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইত। চারিদিকে নৌকা-চালকদিগকে শাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাতে কোন লোক তাহারা বহন না করে। যেন কোন লোকের পক্ষেই নৌকাপথে ভ্রমণ করার কোন সুযোগই না থাকে।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সঙ্গী-সাথী সহকারে আমাকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন। সেতু, নৌকা বা অন্যান্য কোন যানবাহনের সাহায্য ব্যতিরেকেই পূর্ণ শান্তির সহিত পরিবার-পরিজনের অন্যদের সান্নিধ্যে আনিয়া দেন।

পথের কল্পনাতীত বাধাবিঘ্ন ও ভয়াবহ আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তিনি আমার প্রতি নিঃসন্দেহে বিশেষ অনুগ্রহের পরিচয় দান করিয়াছেন। ঘরে পৌঁছিয়া আমরা সকলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই অপ্রত্যাশিত নিয়ামতের শুকুরগোজারী করিলাম। তাঁহার এই সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

আমার শহর অযোধ্যার আকাশে-বাতাসেও বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ লাখনৌর প্রাক্তন নবাবের পত্নী– বেগম হযরত মহল ও তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহ

ঘোষণা করে। এই নবঘোষিত নবাব অবোধ বালক হওয়া সত্ত্বেও এতদঞ্চলের যোদ্ধৃলস্কর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনেপ্রাণে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। চারিদিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল।

ইতোপূর্বে এতদঞ্চলের স্বাধীন নবাবকে পদচ্যুত করতঃ ইংরেজরা তাঁহার শাসিত এলাকা এক প্রকার দখল করিয়া লইয়াছিল। আরামপ্রিয় খামখেয়ালী প্রকৃতির নবাব দেশ শাসন ও প্রজাহিতের কোন চিন্তাই করিতেন না। দিনরাত কেবল গীতবাদ্য ও নর্তকী-গায়িকার সংস্রব চাহিতেন। একজন শাসনকর্তাসুলভ দূরদৃষ্টির যথেষ্ট অভাব ছিল তাঁহার মধ্যে। সর্বোপরি যখন বিদ্রোহী জনতা ইংরেজ শাসনের ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিল, তখন সেই গদীচ্যুত ও নির্বাসিত নবাবের স্ত্রীই দেশের সর্বময় কর্ত্রী এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত পুত্র নবাব হইয়া বসেন। বালক নবাব তাঁহার শৈশবের খেলার সাথীদের সংসর্গের মায়া ছাড়িয়া দায়িত্ব পালনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। বালকসুলভ চঞ্চলমতিত্ব এবং সর্ববিষয়ে অমনোযোগের ফলে দুশমনের গতিবিধি ও শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে কোন ধারণাই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। দেশ শাসন এবং সৈন্য পরিচালনা এমনকি অধীনস্থ লোকজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশটুকু পর্যন্ত দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বালক নবাবের প্রধান আমলা এবং অমাত্যগণের সকলেই ছিল মূর্খ, দুশ্চরিত্র, অহংকারী, অনভিজ্ঞ ও হিংসুক শ্রেণীর লোক। কোন কোন লোক আবার দুশমন ইংরেজদের চর এবং খরিদা গোলাম ছিল। তাহারা গোপনে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা চালাইত। একজনের একমাত্র প্রিয় কর্ম ছিল দরবারে বসিয়া একে অপরের কুৎসা করা, তাহাদের প্রতি আর একজনের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা, চটপট কথা বলা ও বাক্‌পটুতায় বাহাদুরী প্রকাশ করা। ইহাদের অধিকাংশ লোকই ছিল নীচ শ্রেণীর, ইতর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন।

যাহাদের পরামর্শে রাজকার্য পরিচালিত হইত, তাহাদের চিন্তাধারা ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল। পশ্চাৎমুখী চিন্তা ছাড়া কোন প্রকার কল্যাণ-বুদ্ধি তাহাদের মাথায় কোন সময়ই স্থান পাইত না। ধ্বংস ও সর্বনাশ ছাড়া মঙ্গলজনক কোন কিছুর অনুষ্ঠান তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা

যাইত না। যাঁহাদের কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল, তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত দুই চোখ মেলিয়া এই অর্বাচীনের মেলা দেখা ছাড়া করণীয় কিছু খুঁজিয়া পাইতেন না। নবাব, সরকারের আমীর-উমারা ও দায়িত্বশীল লোকদের মধ্যে কাহারও এতটুকু বুদ্ধি ছিল না। ফলে তাহারা শত্রু ইংরেজদের সর্বনাশা পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন প্রকার অনুমান পর্যন্ত করিতে পারিত না। তদুপরি ইহাদের সকলের মধ্যেই যেন ইংরেজের সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক স্থাপনের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছিল।

বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়েই ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এবং সরকারী কর্মচারিগণ শহরে তাহাদের নিজস্ব এলাকায় অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের কল্যাণে তাহারা অবরুদ্ধ অবস্থায়ও অত্যন্ত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করিতেছিল। তাহারা নিজ এলাকার চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া এবং দেয়াল তৈয়ার করিয়া একটি কৃত্রিম দুর্গের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। স্বাধীনতাকামী দেশী সৈন্যগণ তাহাদের এই দুর্গে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া বার বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। কোন অবস্থাতেই তাহারা তাহাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছিল না। এই অবস্থায় অবরুদ্ধ ইংরেজ সৈন্যদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বাহির হইতে প্রচুর গোরা সৈন্য শহরে আসিয়া পৌঁছিল। এই নতুন সৈন্যদল শহরে প্রবেশ করিবার সময় মুজাহিদ বাহিনীর লোকজনেরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে শুরু করে। এই সংগ্রামে বহু গোরা সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাবশিষ্ট কিছুসংখ্যক গোরা সৈন্য অবরুদ্ধ ইংরেজদের এলাকায় পৌঁছিতে সক্ষম হয়। নতুন প্রস্তুতি সহকারে ইংরেজ সৈন্যরা পুনরায় অগ্রসর হইল, তখন দেশী সৈন্যদের প্রায় কেহই তাহাদের বাধা দেওয়ার জন্য সাহস করিয়া অগ্রসর হইল না। ফলে ইংরেজ সৈন্যরা শহর হইতে দুই মাইল দূরবর্তী একটি বাগানের মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিল। চারিদিক হইতেও ইংরেজ শিবিরে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য ক্রমাগত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্যগণ প্রচুর রসদ ও যুদ্ধাস্ত্রের মালিক হইয়া বসিল।

শহরে পূর্ব হইতে যে লশকর মওজুদ ছিল, আর দিল্লী হইতে পালাইয়া আসা যে সমস্ত সৈন্য বেগমের শরণাপন্ন হইয়াছিল, বেগম তাহাদের প্রত্যেককেই যোগ্য মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেতনভুক্ত

সৈন্যদেরও একটি বিরাট দল আসিয়া লাখনৌ শহরে সমবেত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়,সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে অজ্ঞ। নিয়মের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার মত যথেষ্ট শিক্ষা তাহাদের ছিল না। এতদসত্ত্বেও সমস্ত সৈন্য বাগানে অবস্থিত ইংরেজ শিবিরের সন্নিকটে সমাবেশ করা হইল। সৈন্যরা চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া ইংরেজ শিবির অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল।

দীর্ঘদিন যাবত অবরুদ্ধ ইংরেজ সৈন্য এবং অবরোধকারী দেশী লশকরের মধ্যে তীর-ধনুক বিনিময়, বর্শার যুদ্ধ এবং ব্যাপক আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হইয়া ইংরেজ সৈন্যগণ নিকটবর্তী পার্বত্য এলাকার দেশী ভূস্বামীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে শুরু করিল।

ইংরেজদের আবেদনক্রমে পার্বত্য এলাকা হইতে ত্রিশ সহস্রাধিক সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিল।

ইংরেজদের শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হইল। গোরা সৈন্য, ভাড়াটিয়া দেশী সৈন্য এবং লোভী সাহায্যকারীদের লোকলশকরসহ তাহাদের শক্তি বিপুল হইয়া দাঁড়াইল। এই বিপুল শক্তি লইয়া তাহারা নবাব-বেগমের সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বসিল। উপর্যুপরি হামলার দ্বারা শেষ পর্যন্ত তাহারা দেশী অবরোধকারীদিগকে পিছু হটিতে বাধ্য করিল। অবরোধসীমা হইতে পশ্চাদপসরণকরতঃ তাহারা শহর সীমান্তে আসিয়াও নতুন করিয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে পারিল না। এমনকি শেষ পর্যন্ত বেগম ও তাহার অল্পবয়স্ক বালক নবাবকে মহলে রাখিয়াই সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক অমাত্য এই দুঃসময়ে বালক নবাব ও বেগমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল।

সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ব্যাপার হইল—ইংরেজদের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য বেগম তাহার প্রজাদের মধ্য হইতে যে সমস্ত গ্রাম্য লোককে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করিয়াছিলেন, তাহারা যেকোন অদৃশ্য হস্তের ইশারায় ইংরেজদের অনুগত হইয়া গেল। তাহারা মনিবের ইজ্জত রক্ষা ও বিপদের সময় সাহায্য করার জন্য শহরে আগমন করিয়াছিল। অন্ততঃ এই লোকগুলি শেষ পর্যন্ত ঈমানদারীর সহিত যুদ্ধ করিবে, এতটুকু ভরসা

বেগমের ছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, ইহারাই বেগমের প্রধান শত্রুতে পরিণত হইল। যাদের ঈমানের উপর অধিক ভরসা করা হইয়াছিল, তাহারাই সর্বপ্রথম নাসারাদের হাতে ঈমান বিক্রয় করিয়া বসিল। ইংরেজ নাসারাদের পক্ষে তাহারাই তখন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান যোদ্ধা হিসাবে পরিণত হইল। গোরাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহারা যখন শহরের দিকে ধাওয়া করিল, তখন শহরবাসীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া বাড়িঘর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে শুরু করিল।

শহরের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতঃ গোরা সৈন্যরা প্রথমেই বেগম ও নবাবের মহল অবরোধ করে। বেগম পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া বালক পুত্র (নবাব) এবং দুইজন পরিচারিকাসহ প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়া অন্য এক মহল্লায় যাইয়া আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন।

তিনদিন শহরে অবস্থান করিয়া বেগম পলায়নপর বিচ্ছিন্ন সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করিবার জন্য চেষ্টা চালাইলেন। কিন্তু বেগমের পরাজিত সৈন্যরা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই তাহারা আর পুনরায় একত্রিত হইতে সম্মত হইল না। এই সংকটের সময় সৈন্যবাহিনীর পক্ষ হইতে কোন প্রকার কার্যকরী সাহায্য লাভের আশাও চিরতরে বিদূরিত হইল। এমনকি সামান্য কিছু রক্ষীসৈন্য সংগ্রহ করিয়া শহরের কোন এলাকায় একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়িয়া তোলাও সম্ভবপর হইল না। শেষ পর্যন্ত বেগম নিরুপায় হইয়া নবাব এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গী-সাথীসহ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিলেন। তৃণলতাহীন ধু-ধু ময়দানের দিকে তাহাদের যাত্রা শুরু হইল। খবর পাইয়া কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহিলা, স্বল্পসংখ্যক ঘোড়সওয়ার সৈন্য এবং পলাতক শহরবাসীর একটি দল তাহার সঙ্গে যাত্রা করিল। এই দলের প্রায় সকলের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। অনেকেরই পরনে প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় এমনকি জুতা পর্যন্ত ছিল না। অথচ তাহারা সকলেই ছিলেন শহরের বিশিষ্ট লোক। স্ত্রীলোকদেরও প্রয়োজনীয় পর্দা করার মত কাপড় সঙ্গে ছিল না। নগ্নপ্রায়, বে-পর্দা অবস্থায় তাহারাও পদব্রজে পথ চলিতেছিলেন। অথচ মাত্র কয়েকদিন পূর্বেও তাহারা ছিলেন বিশিষ্ট ঘরের অসূর্যম্পশ্যা পুরনারী। ধু-ধু প্রান্তর ও ছায়াহীন ময়দানের পথে চলিতেছিল এই সর্বহারাদের কাফেলা। চারিদিকে শুধু শোনা যাইতেছিল হাহাকার আর আর্তরব। শতচ্ছিন্ন বসনে

বিশিষ্ট ঘরের নারীরা প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়া যাইতেছিলেন। এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্তরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দৈন্য ও নগ্নতার বীভৎসরূপ শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহারা ছিলেন কল্পনাতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত। এই ময়দানের পথে তাহাদের এহেন কষ্টের জীবন যেন দিন দিনই অধিকতর অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। বসনহারা, ঘরহারা, আশ্রয়হারা সর্বোপরি খাদ্য ও পানীয়হারা অবস্থায় তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদোপম বাড়িঘর, প্রচুর ধন-সম্পদ ও জায়গীর-রিয়াসত ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে পথে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল। অথচ কোন অবস্থাতেই তাহারা এই সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সম্পূর্ণ অতর্কিত অবস্থায়ই তাহাদের সম্মুখে এই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই মহাবিপদের তীব্র কশাঘাতে তাহারা এমন সর্বহারায় পরিণত হইলেন যে, তাহাদের চেহারা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া গেল। উস্কখুস্ক চুল, উদাস চেহারা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মূর্ত প্রতীকরূপে ইহারা পথে নামিয়া আসিয়াছিলেন। এই মহাবিপদ শুধুমাত্র শহরবাসীকে পথে বসাইয়া এবং সুখী-সমৃদ্ধ মানুষকে সর্বহারায় পরিণত করিয়াই ছাড়ে নাই; ক্ষমতাশালী আযাদ লোক গোলামে, সম্পদশালী লোক ভিক্ষুকে এবং সম্মানী ভদ্র মানুষকে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ছাড়িয়াছিল। সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলি চোখের সম্মুখে একমাত্র পথ ও পথের বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

আর্তক্রন্দন, হা-হুতাশ ও আক্ষেপের ধ্বনিতে চতুর্দিক গুঞ্জরিত হইতেছিল। রোগীর কাতরানী, মযলুমের ফরিয়াদ, সর্বহারার বিলাপধ্বনি সবকিছুতে মিলিয়া পরিস্থিতি যেন আরও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে আবার আক্ষেপ না করিয়া ব্যথা-ভারাক্রান্ত স্বরে আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া সান্ত্বনা খুঁজিতেছিল

বিপদের তাড়নায় শিশু সন্তানকে অসহায় মায়ের বুক হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। যুবা-বৃদ্ধ সকলেই ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটু আশ্রয়, শোকে একটু সান্ত্বনা এবং রোগে একটু ঔষধের সন্ধান পর্যন্ত কোথাও ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতা এবং সর্বাত্মক বিপদের তীব্রতা তাহাদের অনুভূতি পর্যন্ত বিকল করিয়া দিয়াছিল। দুনিয়ার সবকিছু হইতে তাহারা নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। কল্পনায়ও কোন আশার

কথা তাহারা চিন্তা করিতে পারিতেছিলেন না। জীবন ও মৃত্যু তাহাদের সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইয়াছিল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অনুপম প্রাসাদ ও শুচিস্নিগ্ধতা এবং আনন্দ ও তৃপ্তির অফুরন্ত উৎসে ছিল তাহাদের জন্ম। দুনিয়ার বুকে প্রথম চোখ মেলিয়াই তাহারা দেখিয়াছেন প্রাচুর্য সুরুচিবোধের চরম উৎকর্ষ। কিন্তু আজ তাহাদের চলার পথে প্রতি পদে পদে বাধাবিঘ্ন ও বিপদ-আপদের কন্টক ছড়ানো। পরনের বসনটুকু পর্যন্ত নোংরা, কোন প্রকার পাথেয়ও আজ আর সঙ্গে নেই। অতীতের আরাম-আয়েশের কথা এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। হায় খোদা! তুমি এই অসহায়দের ক্ষমা কর! তাদের দুঃখ দূর করার পথ বাহির কর; দুশমনের বাঁধন, যালিমের হস্ত শিথিল করিয়া দাও; উহাদের ধ্বংস কর।

এমনি অবস্থায় বেগম তাহার সঙ্গী-সাথী ও হতাবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীসহ দুরন্ত নদী ও পার্বত্য প্রান্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত উত্তর দেশের নদীর তীরস্থ একটি গ্রামে তাহার কাফেলা থামিল। সকলকে লইয়া তিনি এখানেই তাঁবু খাটাইয়া বসবাস করিতে শুরু করিয়া দিলেন। নদীর তীরে তীরে সৈন্য মোতায়েন করিয়া দিলেন, যেন সকল নৌকা দখল করিয়া লওয়া হয় এবং শত্রুসৈন্যেরা কোন অবস্থাতেই নদী পার হইয়া সহজে এই নতুন আশ্রয় কেন্দ্রটি আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়।

বালক নবাব ও বেগমের এই নতুন আশ্রয়শিবিরই নতুন রাজধানীর রূপ পরিগ্রহ করিল। এই স্থান হইতে নতুনভাবে চারিদিকে শাহী ফরমানসহ নকীব প্রেরণ করা হইল। বিভিন্ন এলাকায় রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্মচারীও নিযুক্ত করা হইল। সেই সঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ব্যবস্থাও করা হইল। সামান্য সংখ্যক যে সৈন্যবাহিনী তাহার সঙ্গে ছিল, তদ্দ্বারাই এই নতুন রাজধানীর পার্শ্ববর্তী ইংরেজ অধিকৃত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা শুরু হইল। সৈন্যবাহিনীকে নতুন সাজে সজ্জিত করিয়া পুনরায় ইংরেজের সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি শুরু হইল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই সমস্ত কার্যনির্বাহ করার দায়িত্ব এমন একজন অপরিণামদর্শী, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও মূর্খ লোকের হস্তে অর্পণ করা হয়, যাহার দ্বারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কোন যোগ্য লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেও সে প্রস্তুত ছিল না।

মূর্খতাই ছিল তার প্রধান ভূষণ। একটি সাধারণ কথাও সেই ব্যক্তি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতিই সে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করিত না। সর্বোপরি লোকটি ছিল হীন চরিত্র, কাপুরুষ ও নির্বোধ। তার চতুর্পার্শ্বে চরিত্রহীন, নির্বোধ ও ভীরু প্রকৃতির লোকজনই উপস্থিত থাকিত, এই শ্রেণীর লোক ছিল তার প্রধান পরামর্শদাতা। সংকটজনক পরিস্থিতিতে, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে এই শ্রেণীর লোকদেরই পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। এই মূর্খ অহংকারী লোকটি বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সৎলোকদের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিত এবং নিজের খান্দানের ততোধিক মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত লোক বাছিয়া লইত। পরিণামে ফল দাঁড়াইল এই যে, যে সমস্ত সৈন্য পুনরায় আসিয়া সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের উপর অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও চরিত্রহীন লোকদিগকে নেতৃত্বপদে বহাল করা হইল। এই সমস্ত লোক এত হীনচরিত্র ও লোভী ছিল যে, সৈন্যদের জন্য অতিকষ্টে সংগৃহীত রসদ পর্যন্ত তাহারা তসরুপ করিয়া বসিত। আত্মীয়-স্বজন ও ইয়ার-দোস্তদের অপব্যয়ের চাহিদা পূরণের জন্য সৈন্যবাহিনীর জরুরী জিনিসপত্র অপহরণ করতঃ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইত।

এই সমস্ত কাপুরুষের দল সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করিত। কোন দিক হইতে সামান্য একটু শব্দ হইলেই মনে করিত শত্রু বুঝি তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পতিত হইয়াছে। কোন সময়ই কোনখানে স্থিরভাবে বসিতে পারিত না। মনে করিত এই বুঝি মৃত্যুর পরওয়ানা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শত্রুর সম্মুখে অনুগ্রহ ভিক্ষা ছাড়া তাহাদের পক্ষে অন্য কিছু করণীয় আছে বলিয়া মনে হইত না।

খৃষ্টান বাহিনী মূল রাজধানী অধিকার করিয়া লওয়ার পর কিছুকাল সেইখানেই স্থির হইয়া রহিল। পার্শ্ববর্তী কোনদিকে নতুন আক্রমণ পরিচালনা করার ইচ্ছা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া তাহারা রাজধানীর নিকটবর্তী এলাকার কৃষক, শ্রমজীবী ও অমুসলিম অধিবাসীদের মন জয় করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইল। তাহাদের রাজস্ব কমাইয়া দেওয়া হইল । স্থান বিশেষে অর্থ দান করা হইল। সাধারণভাবে সকলের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হইল।

এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের ফলে এই সমস্ত লোক ইংরেজদের অনুগত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্য হইতে ইংরেজরা একটি বিরাট সাহায্যকারী দলও সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। এইভাবে রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ইংরেজরা চারিদিকে অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিল।

সর্বপ্রথম ইংরেজ সৈন্যগণ বেগমের নতুন রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিল। লাখনৌ হইতে মাত্র আট মাইল উত্তরে বেগমের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, ইংরেজ সৈন্যদের আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়াই তথাকথিত সেই মূর্খ সেনানায়ক ও সরদারগণ পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের মধ্যেও সন্ত্রাস ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা উত্তম মনে করিল। কিন্তু সে এলাকার হিন্দুবাসিন্দাদের একটি দল বীরত্বের সহিত ইংরেজ সৈন্যদের মোকাবেলা করিল। তাহারা সংখ্যায় ছিল মাত্র কয়েকশত। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীকে তাহারা সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া ছাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিল না। পলায়নপর সেনানায়ক ও বিপুল পরিমাণ সৈন্যবাহিনীর পক্ষ হইতে কোন সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও তাহারা মনোবল হারাইয়া পশ্চাৎপদ হইল না।

ভীরু-কাপুরুষ সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত এই গ্রামটি দখল করার পর ইংরেজরা সেখানে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিল। মূল কেন্দ্র হইতে আরও সাহায্য আসার পূর্ব পর্যন্ত হতাবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যদলকে এই দুর্গেই বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইল। কূটনীতি বিশারদ ইংরেজ পক্ষীয়গণ ইতোমধ্যে নবাব-বেগমের ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক সেনানায়কদের সম্মুখে নানা লোভ-লালসার জাল বিস্তার করিতে শুরু করিল। তাহারা জানিত যে, এই সমস্ত দুর্বল চরিত্রের লোককে অতি সহজেই খরিদ করা যাইবে। সুতরাং কালক্ষেপণ না করিয়া বিশ্বাসঘাতকদের মানসিক গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহারা সময় কাটাইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষগণ তাহাদের জালে ধরা দিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

এই দিক হইতে নিশ্চিত হইয়া ইংরেজরা পূর্বাঞ্চলে তাহাদের অনুগত ও সাহায্যকারী লোকদের প্রতি মনোযোগী হইল। সেই সমস্ত এলাকায়ও বেগমের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক সৈন্য পরিচালনার কাজে নিয়োজিত ছিল। ইংরেজদের আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারাও পলায়ন শুরু করিল। স্থানীয় গ্রামবাসী এবং চারিপাশের যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিল, প্রয়োজনের সময় তাহারাও শত্রুতা করিল। ফলে দেশী সৈন্যদর দুর্দশার একশেষ হইয়া গেল। দেশের এইসব অবিবেচক লোক স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝিল না। শান্তি-সমৃদ্ধি ও সুখের জীবন ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা বাদ দিয়া তাহারা সাময়িক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহারা দেশদ্রোহী হইল। ধর্মদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতার একশেষ করিয়া ছাড়িল।

এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই আশার এক নতুন আলোর রশ্মি দেখা দিল। একজন পরহেযগার মোত্তাকী, মরদে-মুজাহিদ আল্লাহর বান্দা নাসারাদের আধিপত্য প্রতিরোধ করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইলম-আমল, চরিত্রের শূচিতা ও আত্মার ঔদার্যে তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা, তীক্ষ্ণধী ও দূর দৃষ্টিসম্পন্ন সমরনায়ক। তাহার নাম ছিল নবীয়ে আকরাম (সাঃ) সরওয়ারে দু'জাহানের নামের অনুরূপ (আহমদুল্লাহ শাহ)। । এই বীর নাসারা বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া প্রথম যুদ্ধেই তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইংরেজ নাসারাদের বিরাট বাহিনী তাহার আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত এক হিন্দু জমিদারের দুর্গে যাইয়া আত্মরক্ষা করে। সেইখানে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া রাজধানীতে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠায়। রাজধানী হইতে মুনাফেক দেশী সৈন্য, গ্রাম্য লোক এবং গোরাদের এক বিরাট বাহিনী অবরুদ্ধ ইংরেজদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পরিণামে উহাদিগকেও পূর্ববর্তীদের ভাগ্যবরণ করিয়া পলায়ন করিতে হয়।

সর্বশেষ আক্রমণের সময় এক হিন্দু দেশীয় রাজা এই মরদে মুজাহিদের সহিত চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ইংরেজদের সর্বশেষ আক্রমণের মুখে দেশীয় রাজা এই মুজাহিদকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, চারি

সহস্র সৈন্যসহ সে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ইংরেজ বাহিনীর মোকাবেলা করিতে শুরু করিলেন। দেশী রাজা (বলদেও সিং) চারি সহস্র সৈন্যসহ আসিয়া তাঁহার সহিত শামিল হইল সত্য, কিন্তু সাহায্য না করিয়া পিছন দিক হইতে মুজাহিদদিগকেই আক্রমণ করিয়া বসিল। দুই দিককার এই আক্রমণ সহ্য করার মত ক্ষমতা মুজাহেদ বাহিনীর ছিল না। কিন্তু তাঁহারা পলায়ন করিলেন না বরং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন। এইভাবে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে মরদে মুজাহেদ আহমদুল্লাহ শাহের পতন হইল। তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্যদের সকলেই একে একে শাহাদত বরণ করিলেন। এই হিন্দু রাজা মুখে মুখে আহমদুল্লাহ শাহের অনুগত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ইংরেজদের বন্ধু। ইংরেজ সেনানায়কদের নির্দেশক্রমেই সে মুজাহিদদের সহিত আসিয়া শামিল হইয়াছিল।

মুজাহিদদের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীরু প্রকৃতির অন্যান্য সৈন্যগণ এমনভাবে পলায়ন করিতে শুরু করিল যে, পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার সময়টুকুও যেন তাহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ইহাদের পাকড়াও করিল এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করিল। একমাত্র যাহারা অর্ত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল,তাহারাই কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া রহিল।

এই এলাকার অন্য লোকেরা ইংরেজদের অনুগত হওয়াই উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিল। অবশ্য দুইজন বীর শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার মত নেয়ামত তাঁহারা দুশমন নাসারাদের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেন না। সামান্য কিছুসংখ্যক সৈন্যসহই তাঁহারা বিপুলসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ও তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া ছাড়িলেন। কিন্তু বিপুলসংখ্যক শত্রুসৈন্য ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব হইল না। তাঁহারা শত্রু-ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া গেলেন। এমন নিপুণতার সহিত তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলেন যে, ইংরেজদের পক্ষে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করাও সম্ভবপর হইল না। কিন্তু তাঁহাদের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই সেই এলাকাও পূর্ণমাত্রায় দুশমনের অধিকারে চলিয়া গেল। সৈন্য ও

দেশবাসীর নৈতিক বল ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইংরেজ সৈন্যদের ভীতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই যুদ্ধই ছিল এই দেশবাসী আযাদীপ্রিয়দের পক্ষ হইতে সর্বশেষ প্রতিরোধ সংগ্রাম। ইহার পর প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ শক্তির সম্মুখে আর কোন বাধাই রহিল না। তাহারা নিশ্চিন্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইংরেজবাহিনী যেদিকেই অগ্রসর হইল, লোকজন ভয়ে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিল। কোন প্রকার প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই ভারতের প্রশস্ত ভূমিতে একের পর এক জনপদ তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে লাগিল।

একের পর এক ইংরেজদের বিজয় অভিযান চলিল। মূল বিদ্রোহ অনেক আগেই স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। শুধুমাত্র স্থানে স্থানে দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ও মুজাহিদ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবের আগুন ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ হইতে এক প্রতারণাপূর্ণ ঘোষণা প্রচারিত হইল। অসংখ্য মুদ্রিত কাগজে এই মর্মে এক ফরমান জারি হইল যে, "একমাত্র যাহারা ইংরেজ নারী, শিশু ও অসহায় বন্দীদের উপর নির্যাতন করিয়াছে, আর সন্দেহাতীতরূপে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত বিদ্রোহী সকলকেই সাধারণভাবে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।" এই ফরমান বলে এ দেশে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ মজবুত হইয়া গেল। জনসাধারণের এক বিপুল অংশ এবং যুদ্ধক্লান্ত নিরাশ সৈন্যবাহিনীর লোকজন প্রভৃতি শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় ইংরেজদের সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইল। অবশ্য যাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্রোহের পথে উস্কানি দিয়াছে এবং স্বাধীন সরকার গঠন করিয়া এই দেশ হইতে ইংরেজ শাসনের চিহ্ন চিরতরে বিলুপ্ত করার কাজে নেতৃত্ব দান করিয়াছে, তাহাদিগকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্ষমা করিতে পারিল না। তবু মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক হতোদ্যম লোক ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করাই উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিল।

এইদিকে নবাব-বেগমের সৈন্যবাহিনীতে ব্যাপক নৈরাশ্য নামিয়া আসিয়াছিল। দারুণ অর্থ সংকটে সকলের জীবনই বিপন্ন হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন যাবত বেতন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না পাইয়া তাহাদের জীবন যাত্রা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইংরেজ বাহিনীর ব্যাপক বিজয় অভিযানের

ফলে বেগমের নিকট খাজনা আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভারতের বিশাল পরিধি যেন তাঁহার সম্মুখে দিন দিনই সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার সঙ্গীয় আমীর-উমারা ও পদস্থ ব্যক্তিগণ দারিদ্র্য ও প্রবাসের দুঃখ-কষ্টে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রিয়জনের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, পরিবার-পরিজন হইতে বহুদূরে তাঁহাদের জীবন যেন অর্থহীন এক বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কঠিন জীবনে সামান্যতম একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তাঁহাদের পক্ষে স্বপ্নাতীত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। এ অবস্থায় অধিকাংশ সৈন্য ও পদস্থ ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে প্রচারিত সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পলায়ন করিতে শুরু করিল। ইংরেজদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনের জন্তুগুলি ছিনাইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিল। পরিণামে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া ক্ষুব্ধ মনে অত্যন্ত অপমানের জীবন গ্রহণকরতঃ বাড়ি-ঘরে ফিরিয়া আসিল।

এইভাবে সমগ্র দেশ ইংরেজ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া গেল। কোন এলাকাতেই তাঁহাদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার মত কেহ অবশিষ্ট রহিল না। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখিয়া বেগম তাঁহার সামান্য কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথীসহ আরও গভীর জংগল ও পার্বত্য এলাকার দিকে নেপাল সীমান্তে চলিয়া গেলেন। ভারতভূমির অধিকার এইভাবে ইংরেজদের হাতে স্থায়ীভাবে চলিয়া যায়।

অতঃপর আমার কাহিনী! সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার পর হইতে এই পর্যন্ত বারবার আশা ভঙ্গ ও নৈরাশ্যের বিভীষিকায় আমার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। প্রবাসের জীবন, বিপদ-আপদের সীমাহীন অস্বস্তির বাত্যাপ্রবাহে আমার নৈতিক বলও যেন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধুদের নিকট হইতে দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি, পরিচিত প্রতিবেশীর হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার, সর্বোপরি জন্মভূমির স্নিগ্ধ শীতল হাতছানি আমার মনপ্রাণ উতলা করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময় ইংলেন্ডের রাণীর সেই ফরমান এবং অঙ্গীকারপত্রটি আমার হস্তগত হইল। ফরমানে যেভাবে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, সর্বোপরি শপথের পর শপথ করিয়া যেভাবে উহাকে সাজানো হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার সরল অন্তর আশ্বস্ত

হইল। আমি বিনা দ্বিধায় বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পরিবার-পরিজনের স্নেহ-মমতার টান এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সাধারণ বিচারবুদ্ধিটুকুও আমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অন্যথায় আমি কেন যে এই চিন্তাও করি নাই যে, বেঈমান বে-দ্বীনের অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই। ধর্মহীন কাফেরের শপথের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কিছুতেই উচিত নহে। আখেরাতের ভয় এবং শেষ বিচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে যাহাদের কোন জ্ঞান বা আক্বীদা নাই, তাহারা অঙ্গীকার করিয়া তাহার খেলাফ করিবে, ইহা মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নহে।

অল্প কিছুদিন পরই জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী আমাকে বাড়ি হইতে ডাকাইয়া নিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। এই কঠোর বন্দী জীবন শুরু হওয়ার পরই আমাকে রাজধানীতে (লাখনৌ) পাঠাইয়া দেওয়া হইল। রাজধানী প্রকৃতপক্ষে তখন ছিল ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের প্রধান কেন্দ্রভূমি। এখানে আমার বিচার প্রহসনের দায়িত্ব দেওয়া হইল এমন যালিমের উপর, যাহার সুবিচার বা অনুকম্পা প্রদর্শনের মত সাধারণ যোগ্যতাটুকুও ছিল না। সে ছিল যেমন একগুঁয়ে তেমনি নিষ্ঠুর। তদুপরি দুইটি ইতর প্রকৃতির লোক আমার বিরুদ্ধে তাঁদের বহুদিনের মনের আক্রোশ প্রাণ ভরিয়া বাহির করিল। এই দুই হতভাগ্যের সহিত দীর্ঘকাল যাবত এই ব্যাপারে আমার তর্কযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল যে, কোরআনের সরাসরি নির্দেশ মোতাবেক যে সমস্ত জাতিদ্রোহী মুসলিম নামধারী ব্যক্তি মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত করিয়া খৃষ্টান নাসারাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাহাদিগকে খৃষ্টান নাসারা বলিয়া গণ্য করা হইবে কি না। আমি এই ধরনের লোকদিগকে নাসারাদের চাইতেও অধম বলিয়া মনে করিতাম। তাহারা এই ব্যাপারে কোন দোষ খুঁজিয়া পাইত না। ফলে, আমার সঙ্গে তাহাদের তর্কযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তাহাদের মত ছিল, খৃষ্টানদের সহিত যে কোন শর্তে এবং যে কোন অবস্থায় আপোস রফা করিয়া বসবাস করাতে কোনই দোষ নাই। তাহারা ছিল অর্থের বিনিময়ে দ্বীন ও ঈমান বিক্রয়কারী। এহেন দুই ব্যক্তি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিরুদ্ধে অনেক মনগড়া অভিযোগ করিয়া পূর্ব হইতেই তাহাদের কান ভারী করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে, বিচার-প্রহসনে যা হওয়ার তাহাই হইল। যালিম বিচারক আমাকে আজীবন কারাদণ্ড ও নির্বাসনের নির্দেশ দেয়। এতদ্‌সঙ্গে আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি,

পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত পুস্তকসমূহের বিপুল ভাণ্ডার, এমনকি আমার অসহায় পরিবার-পরিজনের বসবাসের বাড়ি ঘর পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই এই ন্যক্কারজনক ব্যবহার করা হয় নাই। এই দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপত্তা ও ক্ষমার ওয়াদা করার পর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হয়, অথবা আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বলিতে গেলে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে আমার চাইতেও বেশী নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। পূর্ব অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা না করিয়া অসংখ্য মুসলমানের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। কত সুন্দর বাড়িঘর, সুসজ্জিত বাগান এবং মূল্যবান আসবাবপত্র যে বর্বর গোরা সৈন্যরা ধ্বংস করিয়া ফেলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইভাবে যে সমস্ত লোককে নির্যাতন অথবা হত্যা করা হয়, সাধারণভাবে গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ দিল্লী ও লাখনৌর মধ্যবর্তী এলাকাগুলিতে যে সমস্ত বিশিষ্ট পরিবার বসবাস করিত, তাহাদের মধ্যে কোন লোককেই অমানুষিক নির্যাতনের কবল ইহতে নিস্তার দেওয়া হয় নাই।

এই শরীফ লোকদের মধ্যে মুসলিম নামধারী এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেয় যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যদি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের কোনই ভয় নাই। কিন্তু দিল্লীতে যখন সকলেই সমবেত হইলেন, তখন নাসারাদের সন্তুষ্টির জন্য সে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া লয়। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিন্দনীয় কাজ। কিন্তু খৃষ্টানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সেই সাধারণ শিষ্টতাবোধও সে বিসর্জন দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। নাসারা প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্য সে এমনই আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িল যে, আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির চিন্তাও তাহার মস্তকে আসিল না। ইংরেজ যালিমেরা এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও হাতকড়া লাগাইয়া গ্রেফতার করিয়া লইল। তাঁহাদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হইল। কিছুসংখ্যক লোক বন্দী হইলেন অথবা নির্বাসিত হইলেন। আর সেই নাসারার গোলাম, বেঈমান রইস মুসলমানদের পবিত্র খুনের বদলায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রভূত পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।

এমনি অগণিত রক্তপাত ও হৃদয়বিদারক কাহিনীর মধ্য দিয়া ইংরেজ বর্বরতার অবসান হয়। অতঃপর আমার অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন লাভ করিতে থাকে। আমাকে বন্দী অবস্থায় এক কয়েদখানা হইতে অন্য কয়েদখানায়, একপ্রান্তর হইতে অন্য প্রান্তরে এবং নির্যাতনের এক অধ্যায় হইতে অন্য এক অধ্যায়ে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা আমার পায়ের জুতা ও পরনের রুচিসম্মত পোশাক খুলিয়া ফেলে। অতঃপর নগ্ন পদে এবং জঘন্য ধরনের মোটা বস্ত্রে কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করার ব্যবস্থা করা হয়। আমার পরিচ্ছন্ন কোমল শয্যা ছিনাইয়া লইয়া শক্ত, কষ্টদায়ক ও দুর্গন্ধযুক্ত শয্যা দেওয়া হয়। সেই শয্যার কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার নাই। সমগ্র শয্যায় যেন কণ্টক পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল। সামান্য একটি লোটা, পেয়ালা, সাধারণ ব্যবহারোপযোগী একটি বরতন (বাসন) পর্যন্ত আমাকে দেওয়া হয় নাই। সিদ্ধ মাছ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইত; আর পান করিতে দেওয়া হইত গরম পানি। হায়রে স্বদেশপ্রেম! জনতার ভালবাসা আমরা পাইলাম না। এই বার্ধক্যের দিনগুলিতে সেবাযত্নের জন্য উন্মুখ আমার এই দেহ-মন পাইল যিন্দানখানার তপ্ত পানীয়। স্নেহ-মমতার শীতলতা হইতে আমরা রহিলাম দূরে বহু দূরে। তার পরিবর্তে অনবরত আমাদিগকে নির্যাতন, অপমান ও মানবতা-বিরোধী আচরণ সহ্য করিতে হইতেছে।

অতঃপর কুদর্শন দুশমনের যুলুমের শিকার হইয়া আমি নীত হইলাম কালাপানির পার্বত্য এলাকায়। এই স্থানের আবহাওয়া মারাত্মক। সর্বদা যেন মাথার উপর তপ্ত সূর্য অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে। এই মরণদ্বীপের কোথাও পথঘাটের নামগন্ধ নাই। দুর্গম বন্ধুর পথঘাটে সর্বদা হিংস্র প্রাণীর খেলা চলে। এই বিচরণস্থানও আবার মাঝে মাঝে লোনা পানির ঢেউ আসিয়া প্লাবিত করিয়া দেয়; আর রাখিয়া যায় শুধু লবণাক্ত কর্দম ও বিষাক্ত পলিমাটি। এ স্থানের প্রাতঃকালীন বায়ুও 'লু'র ন্যায় গরম এবং ভয়াবহ। এখানকার অমৃতও হলাহলের চাইতে মারাত্মক। এ স্থানের খাদ্য মানুষের উপযোগী নয়। এই দ্বীপের পানি সাপের বিষের চাইতেও মারাত্মক ও ভয়াবহ। এই দ্বীপের আকাশ হইতে যাতনার বৃষ্টি ঝরে। এই দ্বীপের মেঘমালা শুধু নির্যাতন ও দুশ্চিন্তা বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। এই দ্বীপের মাটি সূচগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণধার এবং ইহার কঙ্করপূর্ণ বাতাস অপমান ও লাঞ্ছনার পয়গাম বহন করিয়া আহাজারী করিয়া ফিরে।

আমাদিগকে অপ্রশস্ত অন্ধকার কুঠরিতে বন্দী করা হইল। ঘরগুলির উপরে ছাদ আছে সত্যই, কিন্তু বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই নয়নের অশ্রুধারার ন্যায় বৃষ্টিধারা সমগ্র ঘরটি প্লাবিত করিয়া দেয়। সেই সাথে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে এবং রোগের উৎপত্তি ঘটায়। ব্যাধি-বিমারী এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও ঔষধ এখানে দুষ্প্রাপ্য। অসংখ্য প্রকার রোগ নিত্যই আমাদেরকে আক্রমণ করিতে আসে; কিন্তু সেগুলির প্রতিরোধের পন্থা আমাদের জানা নাই। খুজলি, দাদ ও শরীরের স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়া এখানে রোগের মধ্যেই গণ্য নয়। কিন্তু সামান্য একটু মলম বা মামুলী কোন ঔষধের সন্ধানও আমাদের নাগালের বাইরে।

নামেমাত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থা অবশ্য এখানে আছে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় রোগের উপশম না হইয়া বরং তাহা বর্ধিত হইতে থাকে। চিকিৎসকেরা নতুন নতুন দুঃখ-কষ্টের বার্তাবহ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে বসিয়া একটু সান্ত্বনার বাণী বা হৃদয়বিদারক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটুখানি সমবেদনা প্রকাশের জন্যও কোথাও কোন লোক পাওয়া যায় না। অবজ্ঞা, অবহেলা এবং কটুবাক্য বর্ষণ করিয়া দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করাই এই স্থানের রীতি। মানুষকে কষ্ট দিয়াই এখানে লোকে শান্তি পায়। এখানকার দুঃখ ও রোগ-শোকের সঙ্গে দুনিয়ার আর কোন দুঃখ-কষ্টেরই তুলনা হয় না। সামান্য একটু জ্বর এখানে মৃত্যুর পয়গাম লইয়া আসে। সাধারণ একটু সর্দিতেও মস্তিষ্ক স্ফীত হইয়া অসহ্য ব্যথার সৃষ্টি করে। এখানে এমন অসংখ্য রোগ নিত্যই আক্রমণ করিয়া থাকে, যার উল্লেখ পর্যন্ত কোন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে নাই। ইংরেজ-নাসারা চিকিৎসকেরা রোগীদের উপর নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার খড়গ চালাইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করে মাত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাত্রে পরিণত হইয়া কত লোকের যে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কত লোক যে চিরতরে পংগু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। রোগ না চিনিয়া ঔষধ দেওয়া এবং নতুন নতুন ঔষধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ফলে যাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের মৃতদেহ কাটিয়া দেখা হয়। তারপর সেগুলি শয়তানের দোসর নিকৃষ্ট ডোমদের হাওলা করিয়া দেওয়া হয়। উহারা পবিত্র

লাশের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং নদীতে ফেলিয়া দেয় অথবা কোন পথের ধারে কিংবা বালির স্তূপের নীচে শৃগাল-কুকুরের জন্য রাখিয়া দেয়। দাফন-কাফন বা জানাযার কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই।

কি হৃদয়বিদারক আমাদের এই কাহিনী! মৃতের সঙ্গে এই অমানুষিক ব্যবহার প্রতিনিয়ত চোখের সম্মুখে না হইলে সম্ভবতঃ মৃত্যু কামনাই এখানকার সকলের সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইত, আর ত্বরিত মৃত্যুই হইত সবচাইতে বড় কামনার ধন। আত্মহত্যা যদি ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং আখেরাতে মহা-আযাবের অবশ্যম্ভাবী কারণ বলিয়া নির্দেশিত না হইত, তবে এই নির্যাতনের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে বোধহয় মৃত্যুর শীতল হাত বাছিয়া নেওয়ার পন্থাই সকলে অবলম্বন করিত। এহেন অমানুষিক নির্যাতন কেহই স্বেচ্ছায় বরদাশ্‌ত করিতে চাহিত না।

এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যেই আমি নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ফলে, আমার ধৈর্যের সীমা ভাঙ্গিয়া পড়িল। অন্তর আমার সংকীর্ণ হইয়া আসিল। আমার ভাগ্যাকাশের চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া গেল। যে সামান্য মান-মর্যাদাবোধ আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইতে বসিল। এখন আর ভাবিতেও পারি না যে, এই মহাবিপদ হইতে আত্মরক্ষার কোন পথ আদৌ খুঁজিয়া পাইব কিনা? দাদ-খুজলি অসহ্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সকাল-সন্ধ্যা নিদারুণ কষ্ট ও কাতরানির মধ্যে অতিবাহিত হয়। শরীর জখমের আধিক্যে জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। প্রাণান্তকর ব্যথা-বেদনার মধ্যে আমার দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন যেন আরও অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। রোগের দাপটও ক্রমে বর্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। সেই সময় বোধহয় আর বেশী দূরে নয়, যখন এই খুজলি-পাঁচড়ার নিদারুণ যন্ত্রণা আমাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। হায়! এক সময় ছিল, যখন জীবনের হেন সুখ-শান্তি নাই, যাহা আমার আয়ত্তে ছিল না। আর আজ আমি বন্দী জীবনে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এক যমানা ছিল, যখন আমার নিরুদ্বিগ্ন জীবন সুখী-সমৃদ্ধ মানুষেরও হিংসার উদ্রেক করিত। আর আজ আমি বন্দীত্বের দারুণ কষ্টের মধ্যে পংগু ও চলৎশক্তিহীন হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কিন্তু মৃত্যুও আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে না।

দুশমন যালেমরা আমাকে নিত্য-নতুন দুঃখ-কষ্টে পতিত করিয়া ধ্বংস করিতে তৎপর রহিয়াছে। কিন্তু এই দুনিয়ার বুকে আমার অসংখ্য হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জন থাকা সত্ত্বেও কেহ আমাকে সামান্য একটু সাহায্যও করিতে পারিতেছে না। এই দুশমনদের অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের অপবিত্র অন্তর যেন শত্রুতারই আকর বিশেষ।

এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া আমি এখন মুক্তি পাওয়ার আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি। সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি। তবু পরম করুণাময় বিশ্বপালক আল্লাহর অসীম করুণা সম্বন্ধে আমি নিরাশ নই। সেই পরাক্রান্ত মহান আল্লাহই অত্যাচারী ফেরাউনদের কবল হইতে নিরীহ দুর্বল আল্লাহর বান্দাদের মুক্তির পথ করিয়া দেন। অত্যাচার-অবিচারের শত আঘাত তিনিই তাঁর করুণার প্রলেপ দিয়া শান্ত করিয়া দেন। সকল অত্যাচারী উদ্ধতজনের প্রতি তিনি ক্ষমাহীন কঠোর। সকল ভগ্নহৃদয়ের পক্ষে সান্ত্বনার উৎস আর প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারার জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অবলম্বন এবং সর্বপ্রকার জটিলতা সহজ করিয়া দেওয়ার একমাত্র অধিকারী তো তিনিই। তিনিই হযরত নূহকে ঝড়ের দাপট হইতে, হযরত আইয়ূবকে কঠিন রোগ ও অকল্পনীয় বিপদের হাত হইতে, ইউনুসকে মাছের উদর হইতে এবং বনী-ইসরাঈলকে কল্পনাতীত নির্যাতনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি হযরত মূসা ও হারুনকে ফেরাউন, হামান ও কারুনের কবল হইতে, হযরত ঈসাকে ষড়যন্ত্রকারীদের সীমাহীন ষড়যন্ত্রজাল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বীয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফাকে কাফের শক্তির সর্বপ্রকার শত্রুতা ও আক্রমণের সম্মুখে বিজয়ী করিয়াছিলেন। সুতরাং বিপদ, রোগ-শোক ও সর্বনাশা ভাগ্যবিপর্যয়ের সময় আমিই বা কেন তাঁর অনন্ত অনুগ্রহরাশি হইতে নিরাশ হইব? তিনিই আমার পরওয়ারদেগার, তিনিই ক্ষমাশীল। তিনি সকল অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমাশীল। মৃত্যুর কিনারায় উপনীত হইয়াও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। তেমনি জীবনের প্রতিপদে ভুল-ভ্রান্তির আবর্তে ডুবিয়া থাকিয়াও যদি কেহ তাঁহার কাছে হাত তুলিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কত অগণিত বিপদগ্রস্ত লোক তাঁহাকে

স্মরণ করিয়া বিপদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। পথহারা মুসাফির তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া উদ্ধার পায়, দুঃখ-কষ্ট হইতে নিস্তার লাভ করে। কত নিরাশ মানুষের মনোবাঞ্ছা তাঁহারই নামের ওসীলায় পূর্ণ হয়। হাত-পা বাঁধা অবস্থা হইতেও কত বন্দী তাঁহার মেহেরবানীতে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন-মুক্ত জীবনের স্বাদ অনুভব করিতে পারে!

আমিও আজ মযলুম, ভগ্ন-হৃদয়, দিশাহারা। এই বেশেই আমি আজ আমার মহান পরওয়ারদেগারকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছি। তাঁহার প্রিয় হাবীবের নামের বরকতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার মহান দরবারে আশা পোষণ করিতেছি। তিনি কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না। মযলুম, দিশাহারার আকুল আহ্বান তিনি শুনিয়া থাকেন। মযলুমের ডাকে সাড়া দিবেন বলিয়া তিনি ওয়াদাবদ্ধ হইয়াছেন। বিপদ দূর করার আশ্বাসও তিনিই দিয়াছেন। সেই মহান আল্লাহই আমাকে এই অমানুষিক নির্যাতন হইতে মুক্তি দিবেন। তিনিই বর্তমানের এই অবর্ণনীয় বেদনাময় পরিস্থিতি হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। যে সমস্ত জঘন্য রোগে আক্রান্ত হইয়া আমি আজ বিনা চিকিৎসা ও বিনা যত্নে ছটফট করিতেছি, তিনি আমাকে সেই কালব্যাধির কবল হইতে আরোগ্য দান করিবেন। যাহারা আমাকে নিরর্থক এখানে বাঁধিয়া আনিয়াছে, তাহাদের হাত তিনিই শিথিল করিয়া দিবেন। আমার ক্রন্দন, আমার বেদনাময় হা-হুতাশ একমাত্র তাঁহারই দয়ার্দ্র কর্ণে যাইয়া পৌঁছিবে। তিনিই তার প্রতিকার করিবেন। তিনিই আমার বর্তমান দুর্ভাগ্যের পরিবর্তে জীবনাকাশে সৌভাগ্যের নতুন সূর্যোদয় ঘটাইবেন। তিনিই একমাত্র সর্বশ্রোতা, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী। আমার এই নির্বাসনের বেদনা দূর করিয়া একদিন কল্পনাতীত সুখ ও মর্যাদার অধিকারী করিবেন।

হে আমার পালনকর্তা প্রভু! আমাকে এই নির্যাতনের হাত হইতে মুক্তি দাও। সকল আকাঙ্ক্ষা পোষণকারীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী, সকলের ভরসা ও আশ্রয়স্থল; তোমার প্রিয় হাবীব, তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবীগণ এবং তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের সকলের পাক রূহের ওসীলায় আমার প্রতি করুণা কর। হে দাতা, হে দয়ালু, তুমিই তো অক্ষম মযলুমের পক্ষ হইয়া উদ্ধত

যালিমের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাক। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ কৃতজ্ঞতায় তোমারই সম্মুখে মস্তক নোয়ায়। তুমিই দুনিয়ার সকলকে লালন-পালন করিতেছ। তুমিই সকলের মনের বাসনা পূর্ণ করিবে।

সংক্ষেপে আমার দুঃখ-দুর্দশা ও অমানুষিক বন্দী জীবনের বেদনাময় কাহিনী বলিয়া শেষ করা হইল। অন্যত্র দুইটি কবিতার মাধ্যমেও আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি করিয়াছি। ইতোপূর্বেও অবশ্য কাব্যের ভাষায় আমার নির্যাতন-কাহিনী কালের পাতায় দাগ কাটিতে সমর্থ হইয়াছে। তিনশত পংক্তির মাধ্যমে এক নির্যাতিত আত্মাই মাত্র মুখ খুলিয়াছে। অনবরত কাব্যের ভাষায় গুনগুন করিয়া আমি আমার নিত্য-নতুন নির্যাতন কাহিনী গাহিয়া থাকি। সংগ্রহ করিলে তাও বোধহয় আরবী সাহিত্যের সম্পদ হইয়া থাকিত। কিন্তু জানি না, তা সংগ্রহ করার ন্যায় সামান্য উপকরণের ব্যবস্থা হইবে কিনা। আর এহেন অসহনীয় নির্যাতনের মধ্যে কখনও তা' সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভবপর হইবে কিনা। সর্বশেষ আমি আমার এই কাহিনী হাবীবে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) ও তাঁর পবিত্রাত্মা পরিবার-পরিজনের এবং সাহাবীগণের প্রতি দুরূদ ও সালামের সহিত সমাপ্ত করিতেছি। আল্লাহর উপর ভরসা। সকল কর্মের পূর্ণতা বিধান একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই সম্ভব।

সমাপ্ত